আমাদের
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

শ্রীকালিপদ বসু

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
এম-চক্রবর্ত্তী
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৬২

প্রিণ্টার :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।

—রবীন্দ্রনাথ

জন্মিলে মরিতে হয়, মানুষ অমর নয়। নশ্বর মানব সমাজে এমন দুই একজন আসেন যাঁদের মৃত্যুর পরেও পরবর্তী যুগের মানুষ তাঁদের কথা মনে রাখে। নিজ কীর্তিতে তাঁরা অমর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এঁদেরই একজন।

বিক্রমপুর চিত্তরঞ্জনের পিতৃভূমি। গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নাত সে দেশ। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের দেশ, চাঁদ রায় কেদার রায়ের দেশ, বহু গৌরব গাথার কেন্দ্রভূমি এই বিক্রমপুর।

সেই পুণ্যভূমি আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত।

বিক্রমপুরের মধ্যে তেলিরবাগ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটিই চিত্তরঞ্জনের পিতৃভূমি। এই গ্রামের বিখ্যাত দাশ পরিবারে বাংলার বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রামের

জগদ্বন্ধু দাশ অপুত্রক। তিনি খুল্লতাত ভ্রাতা কাশীশ্বর দাশের কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ভুবনমোহন দাশ। ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

দান এবং অতিথি সংকারের জন্য দাশ পরিবার প্রসিদ্ধ। তেলিরবাগ গ্রামে এঁদের একটি অতিথিশালা ছিল। চিত্তরঞ্জনের পূর্বপুরুষগণ বিশ্বাস করতেন যে অতিথি নারায়ণ। নারায়ণ জ্ঞানেই তাঁরা অতিথির সেবা করতেন। পরিবারের লোকজন কাজকর্ম উপলক্ষে বিদেশে থাকেন। কর্মচারীদের উপর আদেশ যে অতিথি যেন অভুক্ত না থাকে।

অতিথিশালার ভার কর্মচারীদের উপর। কর্তাদের আদেশের জন্য তারা মাথা ঘামায় না—কারণ অত দূর দেশ থেকে তাঁরা ত আর বিস্তৃত খোঁজখবর নিতে পারেন না।

একদিন রাত্রিবেলা এক অতিথি এসে হাজির। পরিশ্রান্ত কর্মচারীরা বিশ্রামের আয়োজন করছে। অতিথি দেখেই তাদের মেজাজ খারাপ।

"কে তোমার জন্য এই অসময়ে ভাতের পিণ্ড নিয়ে বসে আছে! যাও, যাও! আজ কিছু মিলবে না।" ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ক্লান্ত কর্মচারীরা।

অতিথির ছদ্মবেশে এসেছেন দাশ পরিবারের এক কর্তা। নিজের চোখে দেখবেন কেমন কাজকর্ম চলছে। অবস্থা দেখে তাঁর বুক চোখের জলে ভেসে গেল। শুধু বলেন—হায়. হায়,

এভাবে কত অভুক্ত নারায়ণ না জানি তাঁদের দুয়ার থেকে ফিরে গেছে।

কাউকে তিরস্কার করলেন না, কোনও শাস্তিও দেওয়া হল না। শুধু প্রতিজ্ঞা করলেন—এ অন্যায়ের প্রতিকার আবশ্যক, সুব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি জলগ্রহণ করবেন না।

যেই কথা সেই কাজ। মনিবের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে কর্মচারীদের মাথায় বাজ পড়ল। কর্তার পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা নিস্তার পেল। এই বংশে চিত্তরঞ্জনের জন্ম।

ভুবনমোহনের ভ্রাতা দুর্গামোহন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের এক স্তম্ভ। সে যুগের তিনি একজন প্রধান সংস্কারক এবং পথ-প্রদর্শক। যা সত্য বলে বিশ্বাস হয় তা পালন করতেই হবে। এতে কুণ্ঠা করলে চলবে কেন? বিধবা বিবাহের সমর্থক তিনি; ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতা। বিমাতারই বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। লোকনিন্দায় দেশ সরগরম, পথে ঘাটে ছড়া গায়ঃ—

ব্রাহ্মসমাজের কথা কি বলিব আর
দুর্গামোহন দিল বিয়া নিজ বিমাতার।

কিন্তু দুর্গামোহন অচল অটল। তাঁর তিন পুত্রই কৃতিত্বে উজ্জ্বল। জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন কলিকাতায় ব্যারিষ্টার এবং টেগোর ল লেকচারার, মধ্যম সতীশরঞ্জন এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ল মেম্বর, কনিষ্ঠ জ্যোতিষরঞ্জন রেঙ্গুন হাইকোর্টের

জজ। চিত্তরঞ্জনের মধ্যম ভ্রাতা প্রফুল্লরঞ্জন পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি. আর. দাশ—একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং ভক্ত বৈষ্ণব। সুপ্রিম কোর্টের জজ সুধীরঞ্জন দাশও এই বংশের সন্তান। এই বংশেরই শ্রেষ্ঠরত্ন চিত্তরঞ্জন।

ভুবনমোহন এ্যাটর্নীর কাজ করতেন। উপার্জন ছিল প্রচুর, কিন্তু তবুও দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

অথচ নিজে সহজ সরল জীবন যাপন করতেন; বিলাসিতার ধার ধারতেন না। তবুও তার ঐ অবস্থা কেন?

দানের কোন হিসাব ছিল না। কাউকে ধার দিয়ে ফিরে চাইতেন না। সামর্থ্য থাকলে তারা আপনা হতেই দিবে। কেউ জামিন হওয়ার জন্য ধরলে আপত্তি করতে পারতেন না—লোকটি যেরকম প্রকৃতিরই হউক না কেন। বন্ধুরাই তাকে ডুবাল। তাদের জন্য ত জামিন হতে হয়েছে, আবার তাদের অনুরোধে অপরিচিতদের জন্যও হয়েছেন। বিপদের সময় কারও দেখা নাই। পর্বত প্রমাণ ঋণজালে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। ভীষণ অর্থাভাবের মধ্যে তাঁর সংসার চলে; তার উপর পাওনাদারদের তাগাদা। ভ্রাতা দুর্গামোহন যথাসাধ্য সাহায্য করলেন; স্ত্রী নিস্তারিনী দেবী এবং খুল্লতাত ভ্রাতা ৺রাখাল চন্দ্র দাশের পত্নী বিনোদিনী দেবী তাঁদের অলঙ্কার খুলে দিলেন। কিন্তু ঋণের পরিমাণ এত বিপুল যে কোন ফল হল না। দেউলিয়া হলেন। না হলে উপায় কি?

যে বন্ধুদের জন্য তাঁর এই অবস্থা একদিনের জন্যও তাদের দোষ দেন নাই।

বলতেন, 'দোষ কারও নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

নিজের কর্মফলকেই দায়ী করতেন।

ঋণের দায়ে পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের বাড়ী ছাড়তে হল। নানা স্থানে থেকে উঠলেন এসে ১৪৮নং রসা রোডের বাড়ীতে। বাড়ীটি জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীমোহন দাশের! তাঁর দুটি পুত্রই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভুবনমোহন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তরঞ্জনকে তাঁর কাছে দত্তক দিলেন। বসন্তরঞ্জন বাড়ী উইল করেন মাতা নিস্তারিনী দেবীর নামে। সেই সূত্রে চিত্তরঞ্জন ঐ বাড়ীর মালিক।

অভিশপ্ত বাড়ী। এ বাড়ী সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। বাড়ীটি এক বৃদ্ধার, তার অসুস্থতার সময় তার জ্ঞাতিগণ বাড়ীটি কালীমোহনের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। বৃদ্ধা তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। দায়ী অবশ্য জ্ঞাতিগণ; তারা কালীমোহনের থেকে বাড়ীর উচিত মূল্য বুঝে নেয়। কিন্তু বৃদ্ধাকে সম্পূর্ণ অর্থ দেয় না। বাস্তুচ্যুত হয়ে বৃদ্ধা মনের দুঃখে অভিশাপ দেয়—এ বাড়ী যে নেবে সে নির্বংশ হবে।

বসন্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুতে কালীমোহনের বংশনাশ হয়। এরপর চিত্তরঞ্জন অনেকদিন ভাবতেন এ বাড়ী ছেড়ে দিবেন। সেই উদ্দেশ্যে আলিপুরে বাড়ীও কিনলেন। কিন্তু উঠি উঠি

করে উঠা হল না। বিধির বিধান। চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র অকালে মারা যান। শুধু তাঁর নয়। ভ্রাতা প্রফুল্লরঞ্জন এ বাড়ীর স্বত্ব হস্তান্তর করে পাটনা যেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কিন্তু তিনিও এই অভিশাপ থেকে রেহাই পান নাই; তাঁর একমাত্র পুত্র শঙ্করও মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বৃদ্ধার বাড়ীতে বসবাস করেছিলেন বলেই কি ভুবনমোহনের বংশ নির্মূল হয়ে গেল?

তখনকার প্রথা মতো দুর্গামোহন, ভুবনমোহন প্রভৃতির বিয়ে হয় অল্পবয়সেই। ভুবনমোহনের বিয়ের সময় স্ত্রী নিস্তারিনীর বয়স ছিল নয় বৎসর; দুর্গামোহন বিয়ে করেন ছয় বৎসরের মেয়ে ব্রহ্মময়ী দেবীকে। তাঁকে বলা হল ভাসুরকে ছুঁতে নেই। তাঁর জিদ ভাসুর কালীমোহনকে ছুঁতেই হবে। শাড়ী পড়ে দৌড়াতে অসুবিধা হয়, তাই শাড়ী বগলে নিয়েই তিনি কালীমোহনকে ছুঁতে দৌড়াতেন।

তখন ছিল একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। বর্তমান যুগের মত উপার্জন করতে পারলেই আত্মীয়স্বজন থেকে আলাদা হবার ঝোঁক দেখা যেত না। ভুবনমোহনের পরিবারটি ছিল বৃহৎ। বড় এবং মেজ ভ্রাতৃবধূর অকালমৃত্যু হয়। তাঁদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভুবনমোহনের পরিবার। যত ঝামেলা পোহাতে হত নিস্তারিনী দেবীকে। যত মাতৃহীন ছেলেমেয়ের মা তিনি। সকলের আবদার বায়না তাঁর কাছে। সবকিছু হাসিমুখে সহ্য করেন তিনি। এর উপর সংসারে নিদারুণ অর্থাভাব।

দুর্গামোহনের ছেলে সতীশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের চেয়ে কিছু ছোট। ঠানখুড়ির কাছে তাঁর নানারকম আব্দার। প্রতিদিন তাঁর রসগোল্লা চাই। চিত্তরঞ্জনও রসগোল্লা ভালবাসতেন; কিন্তু অবস্থার কথা বুঝে মুখে কিছু বলতেন না। সতীশকে শান্ত করতে রোজই রসগোল্লা আনতে হত। সেটিকে দুই ভাগ করা হত—বড় ভাগ সতীশের, ছোট ভাগ দিতেন চিত্তকে। দুর্গামোহনের মেয়েরা ঠানখুড়ির এই ব্যবস্থায় আপত্তি করতেন। প্রতিদিন সতীশ বড় ভাগ পাবে কেন? দুইজনের বয়স যখন প্রায় সমান, তখন ভাগে তারতম্য কেন?

উত্তর আসত—সতীশের যে মা নেই।

নিস্তারিনী দেবীর ব্যবহারে কোন মাতৃহীন সন্তান মায়ের অভাব বোধ করে নাই। পরের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে নিঃস্ব করে দিয়ে এঁদের আনন্দ!

২

ছোট কাল থেকেই চিত্তরঞ্জনের স্বভাবে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে যখন যে কাজ ধরতেন তাতে প্রাণমন ঢেলে দিতেন। এই গুণটি সমগ্র জীবনই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। পড়ার সময় এমন তদ্‌গতচিত্ত হয়ে পড়তেন যে পড়ার ঘরে কেউ এলে গেলে খেয়াল থাকত না। পরিবারে সমবয়সী আরও ছেলেমেয়ে ছিল, তারা সময় সময় দুষ্টামি করতেন—কিন্তু

চিত্তরঞ্জন তাঁর কাজেই মত্ত। এমন অনেক দিন গেছে যে পড়ার সময় মা দুধ রেখে গেছেন। কে তার খবর রাখে? তাঁর মন তখন পুস্তকের বিষয় বস্তুতে নিবিষ্ট। অনেকক্ষণ পরে এসে মা দেখলেন দুধ তেমনই পড়ে আছে।

'দুধ খেয়েছিস চিত্ত?'

মায়ের প্রশ্নে ছেলের ধ্যানভঙ্গ হত। লজ্জিত হয়ে মার হাত থেকে দুধ নিয়ে খেতেন। এমন আত্মভোলা লোক। সব বিষয়েই তাঁর খেয়াল ছিল, কিন্তু শুধু নিজের সম্বন্ধেই খেয়াল ছিলনা। নিজের সাজ-পোষাক সম্বন্ধেও অনেক সময় উদাসীন থাকতেন। যখন মাট্রিক পড়তেন তখন তাঁর ঘরে আত্মীয়দের দু'-চারিটি ছেলেও থাকত। তাদের তুলনায় চিত্তরঞ্জন একটু বলিষ্ঠ ছিলেন। তাদের জামা তাঁর অনেক ছোট হত। মাঝে মাঝে এমন হত যে চিত্তরঞ্জন অন্য কারও জামা পরে খেতে এসেছেন। সেই জামা তাঁর জামার চেয়ে দু সাইজ ছোট। তাঁকে সে পোষাকে দেখে সকলে হেসে উঠত। যখন বুঝতে পারতেন যে সকলের হাসির উপলক্ষ্য তিনি তখন লজ্জিত হয়ে জামা বদল করে আসতেন। দু সাইজ ছোট জামা; পরার সময় নিশ্চয় অসুবিধা হয়েছে। তাঁর কিন্তু সেদিকে খেয়াল থাকত না।

লজ্জিত হয়ে বলতেন, "ও তাইত, এটা যে ইন্দুর সার্ট; আমার গায়ে ত এটা হয় না। ভারি ভুল হয়ে গেছে।"

তিনি সময় ধরে কাজ করতে পারতেন না। কোন একটি কাজে মন ডুবে গেলে সময়ের দিকে কে লক্ষ্য রাখে? বাবা

কিন্তু এতে অসন্তুষ্ট হতেন, তাঁর স্বভাব বিপরীত। তাঁর স্বভাব ছিল প্রতিটি কাজ সময় মত করা চাই।

বলতেন, "চিত্তের একেবারেই সময়ের জ্ঞান নেই।"

ছেলে যাতে সময় মত কাজ করে এজন্য তিনি চিত্তের ঘরের সব দেওয়ালেই ঘড়ি রাখার বন্দোবস্ত করতেন। সে বাড়িতে দেওয়ালে ঘড়ি, টেবিলে ঘড়ি, পকেটে ঘড়ি—ঘড়ির ছড়াছড়ি। কিন্তু এত করেও পুত্রের স্বভাব বদলাতে পারেন নাই।

ছোট বেলায় চিত্ত যে খুব শান্ত শিষ্ট ছিলেন তা নয়। ছুটির দিনটা দুপুর বেলা বাগানে ঘুরেই কাটাতেন। আমের দিনে মাঝে মাঝে আম বাগানে লুকিয়ে থাকতেন। একদিন চিত্ত ঘরে আসে না। মধ্যাহ্ন বয়ে যায়; স্নান নাই, আহার নাই। খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল দেখা গেল এক কোঁচড় আম নিয়ে গাছের নীচে ঘুমে বিভোর।

ছোটকাল থেকেই তিনি ছিলেন সমবয়স্কদের নেতা। লেডী অবলা বসু তাঁর জ্যেঠতুত বোন। তিনি বলতেন, "চিত্ত আমাদের সবাইকে চারিদিকে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে কি বক্তৃতা দিত!"

বক্তৃতার বিষয় যাই থাকুক না কেন তাঁর কথা শুনে সকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকত। কেউ বুঝতে পারত না সময় কোথা দিয়ে চলে গেল। যাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা আপামর জন-সাধারণকে পাগল করে ছাড়ত শিশুকালে বৈঠকখানা ঘরে ছিল তাঁর প্রস্তুতি পর্ব।

পিতামাতা তাঁর কাছে জীবন্ত দেবতা। কি করিলে মা সুখী থাকবেন সে বিষয়ে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। একদিন দুপুর বেলা মা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। এমন সময় পায়ের কাছে দাঁড়াল চিত্ত। তাঁর গা মায়ের পায়ে ঠেকল।

"তোর গা কি চমৎকার ঠাণ্ডা রে!" বলে পা দুটি ছেলের গায়ে ভাল করে মেলে দিলেন। তারপর বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। সময়ের খেয়াল নাই।

মার ভাল লেগেছে! ছেলে দাঁড়িয়েই আছে। দীর্ঘ সময় কেটে গেল, একটুও নড়াচড়া করেনি; তাতে মার অসুবিধা হবে। পরিণত বয়সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সেবা শুশ্রূষা করা এক কথা, আর সাত আট বৎসরের ছেলের পক্ষে দীর্ঘসময় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা অন্য কথা। নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় থাকা ওদের চরম শাস্তি, ওরা কর্ম চঞ্চল।

শৈশবেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে। কবিতা লিখে লিখে টুকরা কাগজে পকেট বোঝাই করতেন। ভয় করতেন অঙ্ককে। সময় পেলেই কবিতা লিখতেন, না হয় পড়তেন। ছুটির সময় সমবয়সীদের কাছে নিজের কবিতা পড়ে শুনাতেন।

১৬ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। চার বৎসর পরে বি. এ. পাশ করেন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেন সাগর পারে বিদেশে। সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আই-সি-এস হয়ে ফিরবেন এই ছিল উদ্দেশ্য। মায়েরও খুব আশা ছেলে আই-সি-এস হয়ে আসবে। বিধাতা হাসলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস পরীক্ষায় বসলেন। দুই একটি পরীক্ষা খারাপ হল, বাকী পরীক্ষা আর দিলেন না। বন্ধু জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত যথাসময়ে পাশ করে গেলেন।

পরের বছর আবার পরীক্ষা দিলেন। তখন ইংলণ্ডে নির্বাচনের ধূমধাম। সভ্য হবার জন্যে দাঁড়িয়েছেন ভারতবাসী দাদাভাই নৌরজী। চিত্তরঞ্জনের তখন প্রচুর অবসর; পরীক্ষার ফল বের হতে বিলম্ব আছে। তিনি নির্বাচনে মেতে গেলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন দাদাভাই নৌরজীর পক্ষে। সে দেশের লোকদের বুঝালেন যে ভারতীয়দের পার্লামেণ্টের সভ্য করলে ইংলণ্ডেরই কল্যাণ হবে। সেদেশের সংবাদ পত্র তাঁর বক্তৃতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দাদাভাই জয়ী হলেন।

আই-সি-এস পরীক্ষার ফল বের হল। চিত্তরঞ্জন পাশ করতে পারেন নাই। নির্বাচনে জ্বালাময়ী বক্তৃতার জন্য কি ফেল করলেন? না অঙ্কের জন্য? আজও এ রহস্য ভেদ হয় নাই। আত্মীয় স্বজন ক্ষুণ্ণ হলেন। বিধাতা আবার হাসলেন।

হারিয়ে তাড়িয়ে কাশ্যপ গোত্র। অন্য পরীক্ষায় সুবিধা না হলে লোকে ব্যারিষ্টারি পড়ে। তিনিও তাই করলেন। সুবোধ বালক তিনি কোন কালেই হতে পারলেন না। আইন পড়ার সময় একটা ঘটনা ঘটল। ম্যাকলীন নামে পার্লামেণ্টের

এক সভ্য ভারতীয়গণকে দাস জাতি বলে গালি দিলেন। গর্জন করে উঠলেন যুবক চিত্তরঞ্জন। অভদ্রোচিত উক্তির প্রতিবাদে বক্তৃতা করে আগুন ছড়াতে লাগলেন। টনক নড়ল প্রভাবশালী ইংরাজ-মহলে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে উদারনৈতিক দল এক সভা ডাকলেন। গ্লাডস্টোন সাহেব সভাপতি। চিত্তরঞ্জনকে সেই সভায় নিমন্ত্রণ করা হল। তিনি দাবী করলেন ম্যাকলীন সাহেবকে সর্বসমক্ষে দাবী প্রত্যাহার করতে হবে আর ক্ষমা চাইতে হবে। তাই করতে হল। এই অশিষ্ট উক্তির জন্য পার্লামেন্টের সভ্যপদও তিনি হারালেন। যুবকের তেজস্বিতায় এই গুরুতর অন্যায়ের সংশোধন হল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসেন।

এসে ব্যবসা আরম্ভ করলেন। তাঁর ঘাড়ে পিতৃঋণের বিশাল বোঝা। পিতা দেউলিয়া হয়েছেন। সুতরাং পুত্রের পক্ষে তাঁর ঋণের দায়িত্ব নেবার কোনরূপ বাধ্য বাধকতা ছিলনা। কিন্তু আইনের দিক থেকে দায়িত্ব না থাকলেও মনের কাছে মুক্তি পান নাই। মন চাইত পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে মুক্তিলাভ করতে। কাউকে একটি পয়সা বঞ্চিত করা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

৩

আত্মীয় স্বজন নিয়ে সংসারটি বিরাট। সকলের দায়িত্বই তিনি হাসিমুখে বহন করেন। কেউ অন্য রকম বুঝালে বলতেন, "আমি সকলের নিকট ঋণী"।

আইনের ব্যবসায়ে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। সঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ করতে সময়ের প্রয়োজন। হাইকোর্টে তাঁকে প্রতিযোগিতা করতে হয় লর্ড এস, পি, সিংহ, স্যার বি, সি, মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে ; এর উপর খ্যাতনামা বিদেশী ব্যারিষ্টারগণও আছেন। নবীন ব্যারিষ্টারকে ডাকে কে? কাজেই তীব্র অভাব অনটনের মধ্যে তাঁর দিন কাটে। পয়সার অভাবে সবদিন মধ্যাহ্ন সময়ে জলযোগও করতেন না, দুটি পয়সা বাঁচাতে অনেকদিন কোর্ট থেকে হেঁটে বাড়ী ফিরতেন। পয়সার আশায় ছুটাছুটি করতেন মফঃস্বলে ; তাও সামান্য অর্থের জন্য। মাত্র ৫১ টাকা ফিস্ নিয়ে তিনি ঢাকা কোর্টে মোকদ্দমা করে গেছেন। অথচ কয়েক বৎসর পরেই মফঃস্বল গেলে তিনি ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা নিয়ে ফিরতেন। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি কিছুকাল 'ল' লেকচারারের পদ গ্রহণ করেছিলেন।

এত যে অভাব তবুও কর্তব্যে ত্রুটি নেই। ভাইদের ব্যারিষ্টার করার জন্য বিলাত পাঠালেন। ভাই বোনদের শিক্ষা, তাদের বিয়ে, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের লালন পালন—সব দায়িত্ব তাঁর। ভাইদের নিজ সন্তানের মতই জ্ঞান করতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের মৃত্যু সংবাদে মুহ্যমান হয়ে বলেছিলেন, "আজ ভোলাকে না নিয়ে ভগবান আমার ছেলেকে নিলেন না কেন?"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়ে প্রাথমিক অবস্থা, ঘরে খাবার সংস্থান নেই। এমন সময় এল এক অদ্ভুত প্রস্তাব। বিজনী-এস্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদার (মুখোপাধ্যায়) তাঁর বড়মেয়ে বাসন্তীর বিয়ে দিতে চান চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে। চারিদিকে কলরব পড়ে গেল। সকলে বলে, "বরদানাথ কি পাগল? যার ঘরে খাবার সংস্থান নেই তার হাতে মেয়ের বিয়ে?"

ব্রাহ্ম সমাজ ক্ষেপে গেল। যে ছেলে বিদ্রোহী, নাস্তিক, মাতাল—তার হাতে পড়বে ধনীকন্যা বাসন্তী! এযে অসম্ভব কথা!

দুটি কবিতা লিখার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ চিত্তরঞ্জনকে এই অপবাদ দিয়েছিলেন। সর্বোপরি দারিদ্র্য মহা অপরাধ।

এত বাধা সত্ত্বেও বরদানাথ সঙ্কল্পে অটল। মেয়েকে বলতেন, "বাসন্তী, তোকে আমি যার হাতে দিচ্ছি, একদিন দেখবি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার নাম ধ্বনিত হবে।"

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সেদিন হয়ত লোকে হেসেছিল। তখন

কি কেউ বুঝতে পেরেছিল যে তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে ?

এক আই-সি-এসের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। বরদানাথ সে প্রস্তাব বাতিল করেন।

ব্রাহ্ম সমাজ যখন দেখলেন যে বিবাহ নিশ্চিত তখন বরদানাথকে বললেন, 'বেশ চিত্তরঞ্জনকে একটি কথা লিখে দিতে বল যে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।' ভগবদ্ভক্ত চিত্তরঞ্জনের পক্ষে একথা লিখতে আপত্তি হবে কেন ? কিন্তু আপত্তি ছিল একটি বিষয়ে—ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিয়েতে লিখতে হয় যে আমি হিন্দু নই। বিবেকের বিরুদ্ধে তিনি সেকথা লিখেন এবং সেজন্য আজীবন অনুতাপও করেন। এটা কিন্তু তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যাকে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন নাই যে কোন মূল্যে তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন।

ধনীর কন্যা বাসন্তী শ্বশুরবাড়া এসে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চললেন। একদিনের জন্য কেউ বুঝতে পারে নাই যে অত অভাব অনটনে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। যতদিন শাশুড়ী বেঁচেছিলেন ততদিন তিনিই গৃহের কর্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর সংসার পরিচালনা করতেন মেজননদ। এজন্য কোনদিন এতটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। আজকালকার মেয়েদের মত কর্তৃত্বের মোহ তাঁর ছিল না। অন্তরালে থেকে স্নেহ-মমতায় সকলকে তিনি আপন করে নেন। যেমন শাশুড়ী তেমন তার পুত্রবধূ

অলঙ্কার পত্র বা মুল্যবান বস্ত্রের উপর কোনরূপ মোহ তাঁর ছিল না। সরু পাড় সূতীর শাড়ীই ব্যবহার করতেন। স্বামীর দেউলিয়া অবস্থায় বাবার দেওয়া গয়না ও ব্যবহার করতেন না। আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনকেও দেউলিয়া হতে হল। মান ইজ্জত সব গেল। ব্যবসার ক্ষেত্রেও একটা ধাক্কা এল। পিতৃঋণের দায়িত্ব স্বীকার করেই তাঁর অবস্থা অত কাহিল।

পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নের সাথে তাঁকে লড়তে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের জয় হল। তিনি হলেন আইনের ক্ষেত্রে সব্যসাচী, ফৌজদারী এবং দেওয়ানী উভয় বিভাগে প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টার।

অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিবারের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করতে আরম্ভ করেন। ১৯১৩ সালে যাবতীয় ঋণ শোধ করে দেউলিয়া নাম থেকে মুক্তিলাভ করেন।

তাঁর এই দৃষ্টান্তে অবাক হয়ে বিচারপতি ফ্লেচার বলেছিলেন, "কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হবার পর স্ব-ইচ্ছায় সেই ঋণ স্বীকার করে তা পরিশোধ করেন এ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আমি প্রথম দেখলাম"। এ দৃষ্টান্ত কিন্তু আমাদের দেশে আর একটি আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেউলিয়া পিতার যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

লক্ষ্মী সুপ্রসন্না; সুতরাং অর্থ আসতে থাকে বন্যার জলের মত। এই স্বচ্ছলতার মধ্যেও চিত্তরঞ্জন পূর্বের মতই সহজ

সরল এবং স্বজন-দরিদ্র বৎসল। সমাজের নীচের স্তরের লোক দরিদ্র অভাজনগণকে কোন দিনই ভুলেন নাই।

অসাধারণ বদান্যতায় তাঁর তুলনাও বিরল। কোর্টে চলেছেন; এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এসেছেন কন্যার বিবাহে সাহায্যের জন্য। দেবার মত তখন কিছু ছিল না, তাই বিকালে আসতে বলেন। সন্ধ্যা বেলা কোর্ট থেকে ফিরেছেন। সেই ব্রাহ্মণও উপস্থিত। চিত্তরঞ্জন এক বন্ধুর হাতে তাকে হাজার টাকার একটি চেক দেন।

হাজার টাকা! বন্ধুর চক্ষুস্থির। নিশ্চয় কিছু ভুল আছে। বন্ধু চেক ঘুরিয়ে দিয়ে সংশোধন করতে বললেন।

চিত্তরঞ্জন চেকটি আবার পড়ে দেখলেন; তারপর বন্ধুকে বললেন, "ব্রাহ্মণকে দাও, সব ঠিক আছে।

বন্ধু বিরক্ত হলেন। অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের কথার উপর বিশ্বাস করে হাজার টাকা!

সেই দিন সন্ধ্যায় তার এল—চিত্তরঞ্জনকে ডুমরাও মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হয়েছে। পারিশ্রমিক প্রচুর।

বন্ধুকে ডেকে বললেন, "দেখলে, দেনেওয়ালা ভগবান! আমি তুমি উপলক্ষ্য মাত্র।"

কুলীমজুরদের সঙ্গে দরদস্তুর করলে অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, "আমরা নিজেরা বেড়াতে যাবার জন্য এত ব্যয় করি। তাতে আমাদের গায়ে লাগে না: যত দরদাম

২

করি ও বেচারিদের দুটো পয়সা দিবার সময়। আমাদের মতই ওরা উপার্জনের জন্য খাটে। শুধু কি আমাদের খাটুনির মূল্য আছে, ওদের নেই? ওরাই যদি আজ প্যাণ্ট আর সার্ট পরত, তবে ওদেরই দু'আনার জায়গায় দু'টাকা দিতে কেউ দ্বিধা করতাম না। ওরা দুঃখী বলেই আমরা ওদের পরিশ্রমের মূল্য চুরি করি।"

বকশিস দিবার সময় ওদের চার গুণ বকশিস দিতেন। তিনি ছিলেন গরীব দুঃখীর প্রকৃত দরদী।

তাঁর মা'র শ্রাদ্ধের সময় স্থির হল যে গরীব দুঃখীদের খাওয়ান হবে। এক ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন যে ওদের জন্য দই-চিঁড়াই যথেষ্ট—ওরা এই পেলেই বর্তে যাবে।

চিত্তরঞ্জন এই উক্তিতে ক্ষুব্ধ হলেন। এ কি রকম কথা!

বললেন, "আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হলে আমার যাওয়া চলবে না। লোকদের বর্তে যাবার জন্যে আপনি খাওয়ান। আর নিমন্ত্রিতেরা দয়া করে এলে আমি কিন্তু বর্তে যাই।"

তিনি বিশ্বাস করতেন—সবার উপর মানুষ সত্য।

৪

বাংলার ইতিহাসে ১৯০৫ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সালের ১৯শে জুলাই ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজী শিক্ষাকে বাঙ্গালীই প্রথমে বরণ করে নেয়। সেই বাঙ্গালীরাই আবার শাসকবর্গের নানা কাজের বাদ-প্রতিবাদ এবং নানাবিধ দাবীদাওয়া উত্থাপনে মুখর হয়ে উঠে। বিরক্ত হয়ে ভারত সরকার বাংলাকে দুই ভাগ করে বাঙ্গালীর উপর প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা নিতে চান।

প্রতিবাদে বাংলার আকাশ বাতাস ও পথঘাট আলোড়িত হতে থাকে। সে সময় চিত্তরঞ্জন দার্জিলিং ছিলেন। সেখানে জনসভায় তিনি এবং সিষ্টার নিবেদিতা সরকারের এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাঙ্গালী ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। তারা বিপিনচন্দ্র এবং সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিদেশী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। এই স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেন অরবিন্দ, অশ্বিনী দত্ত, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, যাত্রামোহন সেন এবং আরও অনেক জননেতা। বাংলার বাইরে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন তিলক, মালব্য, লাজপত রায়, গোখেল

প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আগুন ছড়াতে থাকেন। পলাশী প্রাঙ্গনের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য বাঙ্গালী যেন মরিয়া হয়ে ঝাপ দিয়েছে স্বদেশী আন্দোলনে। ছাত্রগণ স্কুল, কলেজ বর্জন করে দোকানে দোকানে পিকেটিং করে। জাতীয়তার প্লাবনে বাংলা ডুবু ডুবু।

এই বৎসর বড়লাট লর্ড কার্জন তাঁর কার্যকাল শেষ হবার পুর্বেই পদত্যাগ করে স্বদেশ যাত্রা করেন। যাবার পূর্বে তিনি তাঁর শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন বাঙ্গালীর বুকে। বাংলাকে কেটে দুই ভাগ করা হল। ১৬ই অক্টোবর শিলংএ পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের পত্তন হয়।

১৬ই অক্টোবর কলিকাতায় বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। আন্দোলন চালাতে অর্থের প্রয়োজন। সেই সভায় স্বদেশী ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা উঠে গেল। ছাত্রগণ স্কুল কলেজ বর্জন করে এসেছে, অথচ শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হলে দেশের সর্বনাশ। তাই জাতীয় বিদ্যামন্দির স্থাপন করতে হবে। কিন্তু সেজন্য অর্থ চাই। ময়মনসিং-এর মহারাজ সূর্য্যকান্ত চৌধুরী এবং রাজা সুবোধ মল্লিক প্রত্যেকে এ কাজের জন্য দিলেন এক লক্ষ টাকা। শুধু অর্থ হলেও বিদ্যামন্দির চলে না। চাই একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ, কিন্তু তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবার ক্ষমতা নাই। তাই

সামান্য বেতনে উপযুক্ত অধ্যক্ষের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। অরবিন্দ তখন বরদায়; মহারাজার কলেজের অধ্যক্ষ; সাত শত টাকা বেতন পান। সেখানে তার কত ক্ষমতা, কত সম্মান!

অরবিন্দের আসন নড়ে উঠল। অর্থ ও ক্ষমতা সব ত্যাগ করে তিনি মাত্র ৭৫ টাকা বেতনে জাতীয় বিদ্যা মন্দিরের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে কলিকাতা চলে আসেন। ভারতবাসী স্তম্ভিত হয়ে তাঁর অপূর্ব ত্যাগের কথা শোনে। আন্দোলনের প্রসার দেখে কর্তৃপক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেন। আন্দোলন দমনের জন্য আরম্ভ হল নির্মম অত্যাচার। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল।

বরিশাল সম্মিলনে বালক চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। পুলিশ তাঁকে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করতে বাধা দেয়; সে কিন্তু নিরস্ত হবার পাত্র নয়। লাঠির পর লাঠির আঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হল। পথের ধূলিকণা বালকের রক্তে লাল হয়ে গেল। তবুও মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, আর চলতে থাকে লাঠির পর লাঠির আঘাত। জলে ঝাঁপ দিয়েও রেহাই নাই, সেখানেও মাথার উপর লাঠির আঘাত চলতে থাকে। যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল ততক্ষণ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি থেকে তাকে নিরস্ত করা সম্ভব হয় নাই।

ময়মনসিং সহরেও বন্দেমাতরম উচ্চারণের অভিযোগে

ছাত্র এবং পথচারী নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হয়। চিত্তরঞ্জন সে সময় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় ভাবে নামেন নাই, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান সমর্থক।

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেসন হবে। বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা তিলককে সভাপতি করেন, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্র বসু প্রভৃতির চেষ্টা দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করেন। নির্বাচনের পূর্ব্বে তাঁরা তার করে দাদাভাইয়ের সম্মতি আনেন। কংগ্রেসের মধ্যে তখন ফাটল ধরে গেছে; একদল নরম পন্থী। আর একদল চরম পন্থার সমর্থক। নরম পন্থীরা চান দাদাভাই নৌরজীকে। তার করে তাঁর সম্মতি নেওয়া হয়েছে, বাধ্য হয়ে বিপিনচন্দ্র প্রভৃতিকে সে ব্যবস্থা মেনে নিতে হল। নইলে চরম অভদ্রতা হত।

চিত্তরঞ্জন এতে অত্যন্ত ব্যথিত হল। ক্ষুব্ধ হয়ে অধিবেশনের সময় তিনি কলিকাতা ছেড়ে পুরুলিয়া চলে যান। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত তিলক মুঞ্জে, খাপার্দ্দে প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উঠলেন এসে তাঁরই বাড়ীতে। অতিথি সৎকারের ভার রইল বাসন্তী দেবীর উপর।

তিলকের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাদের মধ্যে চলত নিবিড় আলোচনা। তিলকের দেশ মহারাষ্ট্র চিরদিন চিত্তরঞ্জনকে শ্রদ্ধা করেছে।

বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য আবেদন করে সুরেন্দ্রনাথ ভারত সচিব লর্ড মর্লির কাছে এক তার করেছিলেন। ভারত সচিব সদম্ভে উত্তর করলেন—বঙ্গভঙ্গ পাকা ব্যবস্থা, এর অদল বদল হবেনা।

১৯০৭ সালে বিপিনচন্দ্র এবং ব্রহ্মবান্ধব রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। ব্রহ্মবান্ধবের অপরাধ, তাঁর লিখন রাজদ্রোহমূলক। আর বিপিন চন্দ্রের অপরাধ—তাঁকে ডাকা হয়েছিল কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে সাক্ষ্য দিতে। কিন্তু তাঁর সঙ্কল্প তিনি ইংরেজের বিচারালয়ে কোন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করবেন না; তাই বোবা হয়ে রইলেন। অভিযুক্ত হয়েও তিনি জানালেন যে তিনি মোকদ্দমা চালাবেন না।

চিত্তরঞ্জন ব্রহ্মবান্ধবের মোকদ্দমা চালাতে থাকেন। অনুবাদককে জেরা করার সময় বিচারক খুব অসঙ্গত আচরণ করেন। চিত্তরঞ্জন প্রতিবাদ করে বের হয়ে আসেন। এই ঘটনার পর ব্রহ্মবান্ধব জানালেন যে তিনি ইংরেজের আদালত মানবেন না, তাই জেরা করার প্রয়োজন নাই।

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'আমারও' ঐ অসঙ্গত আচরণ-কারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আর যেতে ইচ্ছে করে না, "আপনাকে হয়ত জেলেই যেতে হবে।"

উপাধ্যায় হেসে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ইংরেজের সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়"।

পূতচরিত্র তাপসের মুখের কথা কি মিথ্যা হতে পারে?

তাঁর দেহে অস্ত্রপ্রচারের প্রয়োজন হল; নিয়ে যাওয়া হল ক্যাম্পবেল হাসপাতালে। সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিদেশী প্রভুজাতী তাঁর কেশ স্পর্শ করতে পারেন নাই।

এর পর আরম্ভ হল আলীপুর বোমার মামলা।

একদল যুবকের দৃঢ় বিশ্বাস যে আবেদন নিবেদন বা বিধিসঙ্গত আন্দোলনের পথে কোন ফল হবে না।

তাঁরা ক্ষাত্র শক্তিতে বিশ্বাসী। সশস্ত্র বিদ্রোহের পথেই দেশের মুক্তি সম্ভব। প্রয়োজন হলে গুপ্ত হত্যার পথে তাঁরা পা বাড়ীতে প্রস্তুত। প্রস্তুতি এবং সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সহজ পথে অর্থাগম হয় না বলে তাঁরা অর্থের জন্য ডাকাতি করে।

বিপ্লবীদের আক্রোশ বিচারক কিংসফোর্ড সাহেবের উপর। মজঃফরপুর সহরে তাঁকে হত্যা করতে যেয়ে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী ভুল করে দুটি মেমকে খুন করে। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রফুল্ল ধরা পড়ে মোকামা ষ্টেশনে। সঙ্গে ছিল রিভলবার। দলেরও নির্দেশ ছিল যে ধরা পড়লে আত্মহত্যা করাই ভাল। প্রফুল্ল নিজেকে গুলি করে পার্টির নির্দেশ পালন করে। ক্ষুদিরাম হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে আরোহন করে। ভেতো বাঙ্গালীর অমন সাহসিক কার্য্য এবং অসাধারণ ত্যাগে সকলে বিস্মিত হয়।

এর পর অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, সত্যেন্দ্রবসু কানাইদত্ত ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁরা রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী এবং হত্যা কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দেশময় প্রবল উত্তেজনা। মোকদ্দমা চলতে থাকে। নরেন গোঁশাই রাজসাক্ষী হয়ে অনেক গোপন কথা ফাঁস করতে থাকে। একদিন দেশবাসী শুনে বিস্মিত হয় যে কানাই জেলের মধ্যে নেই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করেছে। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়ায়ে রিভলবার সংগ্রহ করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। হত্যার অপরাধে আগে কানাই এবং পরে সত্যেন্দ্র বসুর ফাঁসি হয়। মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য তাঁর আত্মীয় স্বজনের কাছে দেওয়া হল। তাঁকে শ্রদ্ধা দেখাতে দেশ যেন ভেঙ্গে পড়ল কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে। ভয়পেয়ে গেল অত্যাচারী শাসকবর্গ। সত্যেন্দ্রের মৃতদেহ আর বাইরে আনতে দেওয়া হল না। জেলের মধ্যে তাঁর সৎকার হল। অপূর্ব আত্মত্যাগে বাংলার মুখউজ্জ্বল করে তোলে মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণদল। সমস্ত দেশ গেয়ে উঠল—

ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে
ফাঁসিতে করিতে জীবন শেষ
পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই
সত্যেন ধন্য করিল দেশ।

সরকারের দমননীতি যতই কঠোর হতে থাকে ততই সংঘবদ্ধ হতে থাকে বিপ্লবী দল; দৃঢ় হয়ে উঠে তাঁদের সঙ্কল্প !

প্রথমে অরবিন্দের মোকদ্দমা পরিচালনা করার ভার পড়ে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর উপর।

চিত্তরঞ্জনের খুব ইচ্ছা ছিল তিনি সে মামলা পরিচালনা করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব নিয়ে কেউ তাঁর কাছে আসে নাই। মনের ইচ্ছা মনেই পুষে রাখলেন। সে সময় তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব চর্চা করতেন। চক্রে বসে পরলোকগত ব্যক্তিদের আত্মাকে আনতে চেষ্টা করতেন। একদিন স্মরণ করলেন ব্রহ্মবান্ধবের আত্মাকে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় অরবিন্দের কথা। চঞ্চল পেন্সিল ঘুরে ফিরে লিখে—You must difend Aurovindu তাঁকেই অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। উল্লাসিত হয়ে উঠলেন চিত্তরঞ্জন।

এদিকে মোকদ্দমার জন্য সংগৃহীত অর্থশেষ হয়ে আসে। ব্যোমকেশ বাবু আর মামলা চালাতে চান না। তিনি সরে পড়লেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আর কৃষ্ণকুমার মিত্র আসেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। মোকদ্দমার ভার তাকেই নিতে হবে। দুই এক দিন মধ্যেই তাঁদের দুই জনকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীনে পাঠান হল। এবার আসলেন উল্লাস করের মা, বলেন, "আমি শুধু আমার ছেলের

জন্য আসিনি, দেশের সব ছেলেদের বাঁচাবার ভার তুমি নাও, বাবা।"

কথা বলে মুগ্ধ হলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বলেন "আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন জয়ী হই।"

শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে ভাবতেন তাঁর কথা, বলতেন "এমন মা না হলে এমন ছেলে হয়? ক'জন মা বলতে পারে আমি শুধু আমার ছেলের জন্য আসিনি? এই মায়েরাই দেশকে ধন্য করবে।"

এবার তিনি তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত মামলা নিয়ে মেতে উঠলেন। পরিশ্রমিক নাম মাত্র। তাতে কি আসে যায়। অরবিন্দ ও তাঁর সহকর্ম্মীদের মোকদ্দমা ব্যবসাও তিনি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। দেশ সেবার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি রাশি রাশি আইনের পুস্তক নিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। স্নান নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই। বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। পুস্তকের মধ্যে তিনি সমাহিত। বাড়ী নিস্তব্ধ; সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। শিশুরাও যেন তাদের চাঞ্চল্য ভুলে গেল, পাছে তাদের শব্দে তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। এ যেন সিদ্ধ লাভের তপস্যা। যে বাড়ী সান্ধ্য বেলা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের কোলাহল মুখর হয়ে উঠত, সেখানে গভীর নিস্তব্ধতা। অনেক দিন খেতেও আসতেন না। মা অফিস ঘরে যেয়ে খাইয়ে

দিয়েছেন। ব্যবসা প্রায় বন্ধ, বাড়ীতে আবার তীব্র আন্দোলন চলতে থাকে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কে খেয়াল করে? সাধনায় তাকে সিদ্ধি লাভ করতেই হবে।

প্রথম যেদিন চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের সমর্থনে কোর্টে দাঁড়ান তখন অরবিন্দ দেখেন সাক্ষাৎ নারায়ণ তাঁর সম্মুখে। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে; সর্বভূতে তিনি নারায়ণকে দেখবেন এতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রথম মোকদ্দমা চলে আলীপুরের সেসন জজ বীচক্রেফট সাহেবের এজলাসে। বীচক্রেফট ছিলেন অরবিন্দের সহপাটী। সেসনের পর হাই কোর্টে মোকদ্দমা চলে। বিচারপতিগণ চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতা, আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং যুক্তি তর্কের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হন।

সুদীর্ঘ দশমাস সাধনার পর তিনি অরবিন্দ এবং তাঁর কয়েকজন সহ কর্মিকে মুক্ত করতে সমর্থ হলেন। বারীন, উল্লাসকর প্রভৃতির কারাদণ্ড হয়। মুক্তি লাভ করে অরবিন্দ তাঁর সহকর্মিগণকে নিয়ে দেশবন্ধুর বাড়ী এলেন। দীর্ঘকালের স্তব্ধ পুরী উৎসব কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। আইনের ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

এর পর ডুমরাওনের মোকদ্দমা। আলিপুর এবং ডুমরাওনের মোকদ্দমায় তিনি ফৌজদারী এবং দেওয়ানী উভয় বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টার বলে গণ্য হন।

কারও মোকদ্দমার ভার নিলে সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত তিনি তাতে মন প্রাণ ঢেলে দিতেন। সে সময় যত আপদ বিপদই আসুক না কেন মোকদ্দমার কথা ছাড়া কোন দিকেই তাঁর খেয়াল থাকত না। ১৯১৪ সালে তাঁর পিতা খুব অসুস্থ। মাতা পিতা তাঁর নিকট জীবন্ত দেবতা। মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি কাছে ছিলেন না। কাজেই পিতার অসুখের সময় দূরে নড়তে চাইতেন না। এমন সময় এমনি জটিল মোকদ্দমা এল। মফঃস্বল যেতে হবে। প্রথমে রাজী হলেন না। কিন্তু বাবার সুচিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থের কথাও ভাবতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমাই নিলেন।

মোকদ্দমা চলছে। মফস্বলে যাওয়ার সময় তিনি বাসন্তী দেবীকে বলে গেলেন, "বাবার প্রতি আমার যেমন কর্তব্য রয়েছে তেমনি যাদের কাজে বাইরে যাচ্ছি তাদের প্রতি আমার কর্তব্যও কম নয়। তাই এর মধ্যে বাবার যদি কিছু হয়েও যায় তবুও আমাকে তোমরা খবর দিওনা —তাহলে আমার ওখানকার কর্তব্যে অবহেলা হবে।"

এরা কোন ধাতের মানুষ!

অবশ্য পিতার মৃত্যুর পূর্বেই তিনি কাজ শেষ করে ফিরে আসেন।

এমনও হতে পারে যে প্রচুর অর্থের লোভে তিনি পিতার প্রতি দায়িত্বকে লাঘব করেছিলেন। সেকথা সত্য

কিনা তাঁর জীবনের অন্য একটি ঘটনা থেকেই তা বুঝা যায়।

১৯১৮ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। রাউলট কমিটির রিপোর্ট নিয়ে তখন দেশ গরম। বোম্বাই পৌঁছামাত্রই চিত্তরঞ্জনের উপর কতকগুলি জরুরি কাজের ভার পড়ে। এমন সময় তাঁর কাছে খবর পৌঁছাল একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন গুরুতর অসুস্থ। খুব মাথা ধরেছিল তাই এসপাইরিন টেবলেট খেয়েছিলেন। টেবলেটগুলি ছিল খুব পুরাতন। বিষক্রিয়ার ফলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক হয়। সকলেই খুব চিন্তিত। চিত্তরঞ্জনকে খবর দেওয়া হল ; তিনি তখন কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত।

বললেন, "চিকিৎসা পত্র যা করবার তোমরাই সব করাও। ও যদি এখন মরেও যায় তবুও আমাকে খবর দিওনা। তাহলে যে দায়িত্ব নিয়ে আমি এখানে এসেছি তা কিন্তু করতে পারবনা।"

উত্তর শুনে সকলে অবাক হয়ে ভাবে—পাগল নাকি ? এরা সত্যিই পাগল। নাহলে যার একমাত্র পুত্র মুমূর্ষু, তিনি ঐকথা বলেন ?

কাজ শেষ করে তিনি পুত্রের কাছে আসেন। তখন বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। ডাক্তার জানালেন, "আর ভয় নেই ; এখন অনেকটা ভাল।"

চিত্তরঞ্জনের চোখ হতে দরদর করে জল ঝরতে থাকে।

কর্তব্যের খাতিরে একমাত্র পুত্রের জীবন সংশয় সত্ত্বেও নির্বিকারভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন। অন্তরে ছিল গভীর উদ্বেগ আর তীব্র ব্যথা। বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে রয়েছেন। কাজেই কর্তব্য যখন শেষ হল তখন পুত্র ব্যথায় কাতর হয়ে শিশুর মত কেঁদেছেন।

এই ঘটনা উপলক্ষ্যে মতিলাল নেহেরু বলেছিলেন, "ভোম্বলের জন্য আমরা সবাই অস্থির, চিত্ত কিন্তু বুদ্ধদেব হয়ে বসে আছে।"

৫

নিজের বিয়েতে ঘোষণা করেছেন, "আমি হিন্দু নই"—এই দুঃখ মন থেকে কোনদিনই যায় নাই। তাই নিজের মেয়ের বিয়ের সময় তিনি সঙ্কল্প করলেন যে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে দিবেন না। পাত্র কায়স্থ অসবর্ণ বিবাহ বলে রেজিষ্ট্রেশন প্রয়োজন। বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষীরা সেই মর্মেই উপদেশ দেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কিছুতেই রাজী হন না। এতে যত অসুবিধা কিম্বা জটিলতাই আসুক না কেন। কোন অবস্থাতেই তিনি আর বলতে রাজী নন—আমি হিন্দু নই। হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজে তুমুল আন্দোলন হতে থাকে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সঙ্কল্পে অটল।

তাঁর ইচ্ছা বিয়ে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে হবে এবং পুরোহিত করতে চান বিপিনচন্দ্র পালকে।

ব্রাহ্ম হয়ে হিন্দুমতে বিবাহ তাও আবার অব্রাহ্মণ পুরোহিত। অনেক আত্মীয় তাঁকে বুঝাতে থাকেন এটা কি বড্ড বাড়াবাড়ি হয় না? হিন্দুমতে অসবর্ণ বিবাহ! এতেই যে যথেষ্ট আলোড়ন হচ্ছে! কাজেই এবার ব্রাহ্মণ পুরোহিতই বিবাহের কাজ সম্পন্ন করুক। অব্রাহ্মণ পুরোহিতের কথা ভবিষ্যতে ভাবা যাবে। এ যুক্তি বাসন্তী দেবীর। বাসন্তী দেবীর এ প্রস্তাব দেশবন্ধু শেষপর্যন্ত মেনে নিলেন। বিনা রেজিষ্ট্রেশনে বিবাহ সুস্থির হল; কিন্তু পুরোহিত হবে ব্রাহ্মণ।

বিবাহের দিনও শিবনাথ শাস্ত্রী এসে বুঝান, "চিত্ত তোমার বাবা এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দেন, আর তুমি কিনা অন্য পথে চলবে!"

চিত্তরঞ্জন উত্তর করেন, "শাস্ত্রী মশায়; আমার বাবা সত্য বলে জেনে তাঁর পিতার ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম সমাজে এসেছেন, সেই পিতার পুত্র হয়ে আমি বিবেকের পথে চলেছি এতে বাবার আশীর্বাদ থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হবনা।"

এমনি শক্ত উপাদানে গঠিত তাঁর চরিত্র। যা সত্য বলে বুঝতেন, শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তা করতেন। বিয়ের দিন মেয়েকে আশীর্বাদ করে বলেন, "যে স্ত্রী স্বার্থশূন্য হয়ে

স্বামীর সংসার তনুমন ঢেলে দেয়, সেই সংসারকে শ্রীমণ্ডিত ও ধন্য করে।"

আবার বললেন, "প্রার্থী যেন তোর দুয়ার হতে শূন্য হাতে ফিরে না যায়; অবশ্য তোর স্বামীর ক্ষমতানুসারেই দিবি। প্রার্থীরূপে নারায়ণ আসেন। মানুষের সেবাই নারায়ণের পূজা, একথা কখনও ভুলিস না; এতে নারায়ণের আশীর্বাদই তুই পাবি।"

সাংসারিক কাজে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু একথা স্বীকার করতে চাইতেন না। মেয়ের বিয়েতে বহু লোকের নিমন্ত্রণ। সুতরাং ভোজের দায়িত্ব মেয়েদের ঘাড়ে থাকলে তাদের খুব কষ্ট হবে, তাই তিনি নিজের ঘাড়েই দায়িত্ব নিলেন। বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন কাজের ভার দিলেন। ব্যস্! তিনি নিশ্চিন্ত। তার ধারণা সকলেই তাদের কর্তব্য নিখুঁত ভাবে করবে। মেয়েরা কিন্তু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে মোটেই খুশী হলনা। বিশেষতঃ মেজবোন; তিনি প্রতিবাদ করলেন। তার ধারণা দাদা সব ডুবাবে।

দাদা কিন্তু তাঁদের বুঝাতে চেষ্টা করেন, "নারে, এবিয়েতে খুব লোক হবে। কাজেই তোদের উপর ভার থাকলে তোদের খুব কষ্ট হবে তাই আমি সব ব্যবস্থা করেছি, তোদের কিছু ভাবতে হবে না।"

মেয়েদের আশঙ্কাই সত্য। কাজের সময় দেখা গেল রান্নার পূর্বেই দুইমণ মাংস চুরি গেছে। মাংস চুরি গেছে

ত কি হয়েছে! বাজারে কি আর অন্য মাংস নেই! চিত্তরঞ্জন সে ব্যবস্থাই করেন। শুধু কাঁচা মাংসই নয়, রান্না করা দ্রব্যাদি কোন পথ দিয়ে সরে যেতে থাকে কেউ বোঝেনা। তারপর যা অবশেষ থাকে অনিমন্ত্রিতেরা এসে সব শেষ করে দেয়। যাদের উপর দেখাশুনার ভার তাদের পাত্তা নাই।

এতেও চিত্তরঞ্জন উদ্বিগ্ন নন; বলেন "এতে ব্যস্ত হবার কি আছে? যাঁদের নিমন্ত্রণ করবার সুযোগ পাই নাই তাঁরা এসে আমার মেয়ের বিয়েতে খেয়ে গেলেন। এতো বরং আনন্দের কথা। আর একবার রাঁধবার বন্দোবস্ত কর। ঠাকুর চাকরকে ভাল রকম বখশিস দাও; ওরা আবার রেঁধে ঠেকা কাজ চালিয়ে নেবে।"

অনিমন্ত্রিতদের আহারের সময় তিনি খুব সতর্ক রইলেন যে কেউ যেন ওদের উপহাস বা অবজ্ঞা না করে। তাদের সমাদরে এতটুকু ত্রুটি হলনা।

মানুষের পূজা নারায়ণের পুজা—এই বাণী ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

সমাজের উপর স্তরে বিচরণ করতেন বলে নিজেকে অপরাধী করতেন। ট্রেন ভ্রমণের সময় প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করেই তখন ভ্রমণ করতেন। কিন্তু ভাবতেন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথা। ওদের অসুবিধার কথা মনে করে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন।

বলতেন, "ওদের জন্যই রেল কোম্পানীর সব চেয়ে বেশী আয়; আর ওদেরই গরু ঘোড়ার মত চলতে হয়। এই অবিচার আমরা চোখ বুজেই সহ্য করি।"

যত সুযোগ সুবিধা মুষ্টীমেয় লোকের জন্য।

অবজ্ঞাতদের যে কত ভালবাসতেন তা না দেখলে বিশ্বাস হয়না।

প্রায়ই বলতেন, "মানুষ—মানুষই; ব্রাহ্মণ হলেও মানুষ, নমঃশূদ্র হলেও মানুষ।"

ভেগাই হালদার বরিশালের এক সমাজ সেবক। নিরক্ষর ও দরিদ্র। জাতিতে নমঃশূদ্র। একবার কলিকাতা এসে দেশবন্ধুর বাড়ী উঠলেন; এখানে কিছুকাল থাকবেন।

দেশবন্ধুর বাড়ী নানা আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ। নানা লোকের নানা মত; সকল মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হয় বাসন্তী দেবীকে। ভেগাইকে নিয়ে পংক্তি ভোজনে অনেকের আপত্তি ছিল। তাই তাঁর পৃথক ব্যবস্থা হল। ভেগাই খুব ক্ষুব্ধ হলেন। চিত্তরঞ্জন কোর্টে চলেছেন, এমন সময় ভেগাই এসে মনের দুঃখে কেঁদে ফেললেন। চিত্তরঞ্জন শুনে মর্মাহত হলেন। বাসন্তী দেবীকে বলেন, "তুমি এর কোন প্রতিবিধান করতে পারলে না?"

"কি করব? তুমি ত জান যে আমি জাতি মানি না; কিন্তু সকলের মন রক্ষা করে চলতে হয় যে।"

"বেশ আজ থেকে ভেগাই আমার সাথে বসে খাবে। তাতে ত কারও আপত্তি হবে না?"

ভেগাইর আনন্দ ধরে না। চিত্তরঞ্জনের পাশে বসে খাবে। মনের আনন্দে সে চিত্তরঞ্জনের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। চিত্তরঞ্জন তাঁকে বুকে জড়ায়ে নিলেন। দুজনেরই চোখ দিয়ে দরদর জল ঝরছে।

এই সরল মানুষটি চিত্তরঞ্জন ও তাঁর মেয়ের বাড়ী কতরকম অত্যাচার করত!

ধূলি মাখা পায়ে কাউচের উপর শুয়ে থাকত। কাউকে দেখলে সরল শিশুর মত বলত "একটু আরাম করে শুই।"

চিত্তরঞ্জনের কাছে অভিযোগ করা হল।

বললেন, "অপরাধ ওর নয়, আমাদের। আমরা এতকাল ওদের মানুষের মত জ্ঞান করি নাই। দূরে রেখেছি বলে ওদের ব্যবহারিক জীবন আমাদের চেয়ে ভিন্ন। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে।"

ভারতের রাজনৈতিক চক্রে দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে। ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সে যুগে প্রাদেশিক সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল; প্রাদেশিক সভার আলোচ্য বিষয় নিখিল ভারত কংগ্রেসে স্থান পেত। ভবানীপুরে সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন। সেখানে তিনি বললেন শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও পল্লী

সংগঠনের কথা, আর বললেন ক্ষমতা দাবীর কথা। দেশের সকল বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। তখনকার দিনে এসব নূতন কথা ; তখন লোকে আবেদন নিবেদন ও বাদ প্রতিবাদের কথা শুনতে অভ্যস্ত।

এর পর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নিখিল ভারত কংগ্রেস। সভাপতি নির্বাচন নিয়ে দুই দলে কেমন মন কষাকষি চলছে। একদলে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন বসু প্রভৃতি মডারেটগণ ; তারা চান মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করতে। এদিকে জাতীয়তাবাদীরা চান অ্যানি বেশাণ্টকে সভাপতি করতে। এদলে আছেন অরবিন্দ। বিপিন পাল। চিত্তরঞ্জন ও তাদের অনুগামীগণ। অ্যানি বেশাণ্টকে তখন অন্তরীণে আটকে রাখা হয়েছিল। তার অপরাধ যে তিনি ভারতের জন্য স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে আন্দোলন করতেন। চিত্তরঞ্জনদের মত এই যে তাঁকে সভাপতি করলে ইংরেজের এই অন্যায়ের প্রতিবাদও হবে আর ঐ বিদেশী মহিলার প্রতি সম্মান দেখানও হবে। সুদূর সাগর পার থেকে এসে এই বিদেশী মহিলা ভারতের জন্য যা করছেন তার জন্য ভারতবাসী তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

চিত্তরঞ্জন তখন রাজনীতির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বেশ জড়িয়ে পড়ছেন। ইংরেজ শাসকগণ চণ্ডনীতির আশ্রয় নিয়েছেন, দেশ প্রেমিক নেতা ও যুবকগণকে চারিদিকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। চিত্তরঞ্জন দেশের নানা স্থানে ঘুরে

ঘুরে এই দমন নীতির প্রতিবাদ করতে থাকেন। তিনি প্রকাশ্য ভাবে বলতে থাকেন যে, তিনি গুপ্তহত্যা সমর্থন করেন না, কিন্তু এই সব বিপ্লবী যুবকদের দেশপ্রীতি ও আত্মহত্যাকে শ্রদ্ধা করেন। ওদের উপর দমন নীতি নিষ্ফল হতে বাধ্য। বিপ্লববাদকে দমন করতে হলে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে আর এই সব যুবককে দেশের কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া বিপ্লব আন্দোলন দমনের পথ নাই; অত্যাচারে ফল হবেনা, অশান্তি বাড়বে।

সভাপতি নির্বাচন নিয়ে অনেক বাদবিসম্বাদের পরে দুই দলে আপোশ হয়ে অ্যানি বেশাণ্টকেই সভাপতি করা হয়। অধিবেশনের পুর্ব্বেই সরকার অ্যানি বেশাণ্টকে ছেড়ে দেন। তাঁকে সম্মান দেখাতে যে শোভাযাত্রা বাহির হয় তাতে কলিকাতা সহর যেন ভেঙ্গে পড়ে। সর্বত্র তাঁর উপর পুষ্প বৃষ্টি হতে থাকে। এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন এক অসম সাহসিক প্রস্তাব করেন যে পনের বৎসর মধ্যে ভারতবাসিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। সে যুগের কংগ্রেসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রস্তাব।

অধিবেশনের সময় তাঁর বাড়ীতে কী কর্মচাঞ্চল্য। এদিকে বন্দেমাতরমের গানের মহড়া চলছে; অন্যদিকে নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের আলোচনা, তদুপরি বিশিষ্ট অতিথিদের ভিড়। তাঁর বাড়ীতে উঠেছেন মহম্মদ আলি শৌকৎ আলির মা, এসেছেন মোহাম্মদ আলি জিন্না।

পরের বৎসর দিল্লী কংগ্রেসে আবার পনের বৎসরের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবের আলোচনা চলতে থাকে। শ্রীনিবাশ শাস্ত্রী এই প্রস্তাব সংশোধনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁকে সমর্থন করেছেন বিপিন পাল ও অ্যানি বেশাণ্ট। চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা যে তাঁর প্রস্তাব বহাল রাখতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। সর্ব ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এদিকে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাকট এবং রৌলট বিলের আলোচনায় দেশে তুমুল আন্দোলন চলছে। রৌলট বিলে সরকারের দমন নীতির সমর্থন করার চেষ্টা চলছে। এই নিয়ে দেশে প্রবল উত্তেজনা। বিনা বিচারে বন্দী রাখা চলবে না, দমন নীতি বন্ধ করতে হবে।

প্রতিবাদ যতই বাড়ছে, দমন নীতি ততই তীব্র হচ্ছে, রৌলট বিল আইনে পরিণত হল। মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ ঘোষনা করেন; তাঁকে সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন।

১৯১৯ সালে ২৩ শে এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। একটি প্রাচীর বেষ্টিত মাঠে প্রতিবাদ সভা হবে।

প্রাচীরের বাইরে সারি সারি বাড়ী। হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছে; এসেছে বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা। মাঠটিতে তিলধারণের স্থান নাই।

সভা করতে নিষেধ করা হল না। কাউকে ঢুকতে বারণ করা হল না! সভার কাজ আরম্ভ হবে, এমন সময় ডায়ার সাহেব গোরা সৈন্য নিয়ে হাজির। ঢুকবার পথে মেসিন গান বসান হল, প্রাচীরের উপর মেশিন গান নিয়ে তৈরী হল গোরা সৈন্যগণ। অধিনায়ক হুকুম দিলেন, আরম্ভ হল অবিরাম গোলা বর্ষণ। কীটপতঙ্গের মত হাজার হাজার নর নারী মরতে থাকে, আহতদের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হয়। সম্পূর্ণ মাঠটি রক্তে লাল হয়ে গেল। গাড়ী গাড়ী মাটি চাপা দিয়েও সে রক্তের দাগ মুছে ফেলা সম্ভব হয় নাই। সৈন্যদের পাহারায় গাড়ী গাড়ী মৃত ও আহতকে অপসারণ করা হয়। কোথায় নেওয়া হল কেউ জানতেও পারল না। মৃত ও আহতের সংখ্যাও অজ্ঞাত রয়ে গেল। দুমাস পরেও রক্তের দাগ ইংরেজের র্ববরতার সাক্ষ্য দিয়েছে। অপসারণের পরেও মাঠে স্তুপীকৃত ছোট জুতা ও ভাঙ্গা কাচের চুড়ির পরিমান দেখে মানুষ বিস্মিত হত। ইংরেজ জাতি ক্ষিপ্ত হয়ে বর্বরতার কোন সীমায় পৌছাতে পারে জালিয়ানওয়ালাবাগ তার প্রমান। এ ছাড়াও পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। অধিনায়কের সম্মুখে শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তরবারিতে বিদ্ধ করা হয়েছে। মার সম্মুখে শিশু যন্ত্রনায় ছটফট করছে, সৈন্যদের মুখে পৈশাচিক হাসি।

অধিনায়কের নির্দেশে শত শত নারীর উপব অত্যাচার হয়েছে।

এই সংবাদে সমগ্র দেশ শিউরে উঠল। মর্মাহত চিত্তরঞ্জন স্থির করেন তিনি সত্যাগ্রহ করে জেলে যাবেন।

যে মাসে ময়মনসিংহ সম্মিলনে চিত্তরঞ্জন ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার প্রস্তাব করেন। আমাদের ভাবতে গর্ব হয় যে অসহযোগের প্রস্তাব প্রথমে বঙ্গদেশেই উত্থাপিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল, প্রায়ই তাঁর জীবনী পড়তেন আর বলতেন, "আমাদিগকেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পথেই চলতে হবে। পরাধীন ভারতের উহাই পথ" চৈতন্য দেবই প্রথমে নিরুপদ্রব আন্দোলনের পথ দেখালেন। কাজী কীর্তন নিষিদ্ধ করেছেন। মহাপ্রভু বলেন, "কীর্তন হবে না? বাড়ীতে হবে কীর্তন প্রকাশ্য রাজ পথেও হবে।"

মহাপ্রভু হাজার হাজার লোক নিয়ে কীর্তন করে রাজপথে পরিক্রমা করলেন। কাজীর প্রাঙ্গনেই কীর্তন করেন। কাজীকে তাঁর অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করতে হল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে লিখলেন যে তাঁকে মহামান্য সরকার বাহাদুরের সম্মান ভার থেকে মুক্তি দেওয়া হউক। তিনি স্যার উপাধি ত্যাগ করেন।

অমৃতসরে চিত্তরঞ্জনের ডাক এল। কংগ্রেস থেকে এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। মহাত্মাজী, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু, জয়াকার এবং আব্বাস আয়েবজী সেই কমিটির সভ্য। এদিকে সরকার থেকেও একটি তদন্ত কমিটি বসান হয়, হাণ্টার সাহেব তার সভাপতি। প্রথমে কথা ছিল যে চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল হাণ্টার কমিটির সম্মুখে যারা সাক্ষ্য দিতে আসবে তাদের জেরা করবেন, যাতে সত্য কথা চাপা না পড়ে।

তাঁরা দাবী করেন যে সরকার পক্ষে যেমন মাইকেল ও ডায়ার, জেনারেল ডায়ার প্রভৃতি সাক্ষ্য দিলে অন্য পক্ষেও তেমন হরকিষণ লাল, সৈফুদ্দিন কিচলু প্রভৃতিকে ডাকা হউক। তাঁরা তখন কারারুদ্ধ। সরকার তাঁদের উপস্থিত করতেও রাজী নন কিম্বা তাদের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করতেও রাজিনন। সুতরাং হাণ্টার কমিটিকে বর্জন করতে হল। তদন্ত কার্য একদিন দুদিনে শেষ হবার নয়, কয়েক মাস থাকতে হবে। চিত্তরঞ্জনকে নিজ ববসায় নষ্ট করে অমৃতসরে আসতে হল।

১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সম্পুর্ণ অসহযোগিতার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও মহাত্মাজী পুর্ণ সহযোগিতায় বিশ্বাসী। সভ্যগণ দুই শিবিরে বিভক্ত। তিলকের মধ্যস্থতায় উত্তেজনা হ্রাস পেল। তাঁর প্রস্তাব হল পারস্পরিক সহযোগিতা—

অর্থাৎ সরকারের যে সব ব্যবস্থা দেশের পক্ষে মঙ্গল জনক সেখানে সহযোগিতা, যে ব্যবস্থায় দেশের পক্ষে অকল্যান সেখানে অসহযোগিতা।

হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। তাঁরা দমন নীতির সমর্থন করেন, ডায়ার সাহেব পুরস্কৃত হলেন। এই ইংরেজ জাতিই একদিন গভর্ণর হেষ্টিংসের বিচার করেছিল।

কংগ্রেস তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেন বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে পদত্যাগ করতে হবে, ডায়ার সাহেবকে পদচ্যুত করতে হবে। কিন্তু সে সুপারিশ গ্রহণ করে কে ?

অমৃতসরের পর কলিকাতা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে মহাত্মা ও চিত্তরঞ্জনের মতের পরিবর্তন দেখে দেশ বাসী বিস্মিত হয়। মাহাত্মাজী অসযোগিতা চান, আর তাঁর বিরোধিতা করলেন চিত্তরঞ্জন এবং কঠোর সমালোচনা করেন বিপিন পাল এবং লাজপত রায়।

মহাত্মাজী বলেছিলেন, "খিলাফৎ যখন অসহযোগ প্রস্তাব করেছে তখন আমরা কংগ্রেসও তাতে যোগ দি।" এখানেই অনেকের আপত্তি। বিপিন পাল বললেন, "খিলাফৎই বল আর জালিয়ানওয়ালাবাগই বল, কোনটাই স্থায়ী ব্যাপার নয়। এদের উপলক্ষ্য করে অসহযোগের ভিত্তি কোন মতেই দূর হবে না। আমরা স্বরাজ চাই, স্বরাজ না পেলে অসহযোগ করব।"

চিত্তরঞ্জনেরও অনেকটা এই মত; অধিকন্তু তিনি দেশকে প্রস্তুত করার জন্য পাঁচ বৎসরের সময় চান এবং একটা কার্য সূচীও দাখিল করেন।

বিপক্ষ দল সমালোচনা করে—ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছে।

কেউ টিটকারি কাটে—উনি এখনই প্রাকটিস্ ছাড়তে প্রস্তুত নন; আরও পাঁচ বৎসর প্রাকটিস করতে চান।

মহাত্মাজী মুসলিম সহযোগিতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন, আর বিপিন পালের ছিল ভিন্নমত। তিনি বলতেন, হিন্দু মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করে ভাল কথা নইলে হিন্দুকে এমন শক্তি সঞ্চয় করতে হবে যাতে বৃটিশ এবং মুসলিম শক্তির মোকাবিলা করতে পারে।

বিপিনচন্দ্রের মত যাহাই থাকুক না কেন সহযোগিতা বর্জন বিষয়ে চিত্তরঞ্জন মহাত্মাজীর সঙ্গে একমত, কিন্তু মতভেদ অসহযোগিতার উপায় নিয়ে।

তারপর নাগপুর কংগ্রেস। সকলেই আশা করেছিল যে অসহযোগ প্রস্তাব আবার উঠবে এবং চিত্তরঞ্জন তাঁর দলবল নিয়ে বিরোধিতা করবেন। কিন্তু এবারও সকলে তাঁর আচরন দেখে আশ্চর্য্য হন। গত অধিবেশনে যিনি বিরোধিতার নায়ক, তিনিই এবার অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করছেন।

আসল ঘটনাটি হল এই। পর বৎসর মাহাত্মাজী

দেশবন্ধুর সমালোচনা স্বীকার করে তাঁর হাতেই প্রস্তাব সংগঠনের ভার ছেড়ে দিলেন। নিজে সেই প্রস্তাব সংগঠন করে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে তাহা উত্থাপন করেন। ক্রমশঃ রাজনৈতিক কাজে তিনি এতদূর জড়িয়ে পড়তে থাকেন যে ব্যবসায়ে তেমন মন দিতে পারেন না। মাঝে মাঝেই বলতেন, "নাঃ! দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা যায়না।"

নাগপুর কংগ্রেসের প্রায় দুই বৎসর পূবে এক সন্ন্যাসী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, "তুমি বৎসর খানেকর মধ্যেই ভোগ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে।"

সন্নাসীর কথা মিথ্যা হয় নাই। নাগপুর কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই তিনি ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। ভোগৈ-শ্বর্য্যে পরিপুষ্ট চিত্তরঞ্জন সন্ন্যাসীদের মতই ত্যাগের জীবন গ্রহণ করেন।

স্ত্রীপুত্রকে বললেন, 'জানি, তোমাদের অনেক কষ্ট হবে, কিন্তু আমি কি করব? আমি যে এর মধ্যে থাকতে পারছিনা।" তাঁদের কাছে উৎসাহ পেয়ে অনেকেটা আশ্বস্ত হলেন।

কিন্তু তবুও কি দুশ্চিন্তার শেষ হয়? তাঁর উপার্জিত অর্থে যে সব দীন দুঃখী, অনাথ, অন্ধ আতুর প্রতিপালিত হয় তাদের কি হবে? তাদের সংখ্যা ত কম নয়। মাস গেলে তারা সাহায্যের জন্য আসে বা মনিঅর্ডারের

প্রতিক্ষা করে। তাঁর আয়ের একটা বড় অংশ তাদের জন্য ব্যয় হয়।

কোন উপায় খুঁজে পান না, মনকে প্রবোধ দেন, আমি কি করব? আজ যে আমার আরও বড় কর্তব্যের ডাক এসেছে। তখন যিনি দেখতেন এখনও তিনি দেখবেন। এপথে আমাকে যিনি ঠেলে দিয়েছেন তিনিই তাদের রক্ষা করুন।"

তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা খসে পড়লো। সবরকমের নেশাও ছাড়লেন। ৬০ইঞ্চি বহরের ফরমাইসি ধুতি ছাড়া যিনি পরতেন না, তাঁর অঙ্গে মোটা খদ্দরের ধুতি, ফিন ফিনে গিলেকরা ধপ ধপে পাঞ্জাবীর স্থলে খদ্দরের মোটা ফতুয়া। দেখে কারও মনে হয় না যে এতে তাঁর কোনরূপ কষ্ট হচ্ছে। লোকমান্য তিলকের আশাই সফল হল।

তিনি একদিন বলেছিলেন, "আমার আশা হয় এমন একদিন আসবে যেদিন দেশগৌরব চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত শক্তি দেশ সেবায় নিয়োগ করবেন এবং উজ্জ্বল দীপের মত দেশবাসীকে পথ দেখাবেন।"

১৯২১ সালের জুলাই মাসে ভারতের রাজনৈতিক গগণে এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়। আই সি এস পাশ করে সে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সুভাষ চন্দ্র দেশে ফিরে আসলেন। দেখা করলেন মাহাত্মার

সাথে, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করবেন। কিন্তু আলাপ করে খুব খুশী হতে পারলেন না। সুভাষচন্দ্র এতকাল বিদেশে থেকে সে সব দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন লক্ষ্য করেছেন। সেই পরি প্রেক্ষিতে তিনি বিচার করতে চান মহাত্মার কর্মপন্থাকে। মহাত্মার চিন্তাধারা স্বতন্ত্র। সুভাষের মনে হয় মহাত্মার কর্মপন্থা অসম্পূর্ণ।

মহাত্মা তাঁকে বললেন, "বাংলা দেশে যেয়ে দেশবন্ধুর নির্দেশ মত কাজ কর।"

দেখা করলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। উপযুক্ত নেতার সন্ধান পেয়ে তাঁর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। উল্লসিত হয়ে বললেন, "আমি এমন লোকের সন্ধান পেয়েছি নিজ কর্মপন্থা সম্বন্ধে যাঁর ধারনা সুস্পষ্ট। যিনি নিজের সব কিছু দিতে পারেন এবং অপরকেও সব কিছু দিবার জন্য আহ্বান করতে পারেন।"

সুভাষকে পেয়ে দেশবন্ধুর উৎসাহও বেড়ে গেল।

চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে অরবিন্দও একদিন বলেছিলেন। "কালোচিত কৌশলের সঙ্গে দূরদর্শিতার সমন্বয় একমাত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেই দেখা গিয়েছে।"

১৯২১ সাল। কংগ্রেসের প্রচারের জন্য চিত্তরঞ্জন দেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। গেলেন কওড়া, মালদহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি হয়ে সিরাজগঞ্জ। এমন

সময় খবর এল চাঁদপুরে চা বাগানের কুলীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ চা বাগানের কুলীরা কাজছেড়ে চাঁদপুর চলে এসেছে। তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সৈন্য চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে চলছে নিষ্ঠুর অত্যাচার। চোখের সামনে নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর কর্ম্মীরাও প্রতিবাদ করে ধর্ম্মঘট করেছে।

তার পরে চিত্তরঞ্জন গোয়ালন্দ আসেন; ইচ্ছা চাঁদ পুর যাবেন। যতীন্দ্রমোহনও তাঁকে সেখানে ডেকেছেন। কিন্তু যাবেন কি ভাবে? ধর্মঘটের ফলে ষ্টীমার চলাচল বন্ধ। জেলে ডিঙ্গী ছাড়া যানবাহানের আর কোন উপায় নাই। কিন্তু পদ্মার মত ভীষণ নদীতে ঝড় বাদলের দিনে জেলে ডিঙ্গী মোটেই নিরাপদ নয়। এমনিতেই ৮।১০মাইল চওড়া নদী, কোন কোন স্থলে তারও বেশী। বর্ষাকালে পদ্মা কিরূপ ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ছোট ছোট পাহাড়ের মত অজস্র ঢেউ নদীর বুকে তোল পাড় করছে। ঝড়ের মুখে বড় বড় ষ্টীমারও নাজেহাল হয়ে যায়, নৌকা ত ডুবের কথা।

অসহায় কুলীদের জন্য চিত্তরঞ্জনের প্রাণ কাঁদছে। তিনি স্থির করলেন যে জেলে ডিঙ্গীতেই যাবেন।

তাঁর সঙ্কল্পের কথা শুনে সকলে অবাক। বর্ষাকালে জেলে ডিঙ্গীতে পদ্মা পাড়ী! এ অসম্ভব কথা।

সকলেই ঘোর আপত্তি জানায়।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন শুধু বলেন, "আমি কোন বাধা মানি না, আমাকে যেতেই হবে।"

তিনি জেলে ডিঙ্গীতে যাত্রা করলেন; সঙ্গে বাসন্তী দেবী, সুপ্রভা দেবী ও সত্যেন্দ্র মিত্র। তাঁদের কোন মতেই নিরস্ত করা গেল না। ওদিকে পদ্মা রোষে গর্জন করছে. বুকে তার উদ্দাম তরঙ্গ। সন্ধ্যার দিকে প্রবল ঝড় এল।

মাঝি হাঁক দেয়—সামাল, সামাল।

ক্ষুদ্র ডিঙ্গী মোচার খোলের মত দুলছে।

মাঝি বলে, "কর্ত্তা, আপনাদের বুঝি আর পৌঁছে দিতে পারলাম না।"

নৌকা বাঁচাবার সকল আশা ত্যাগ করে ওরা জলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। হঠাৎ নৌকা ঘুরে গেল চরের দিকে। একটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় নৌকা তীরের মত ঘুরে এল চরের ধারে। এবার বুঝি ডিঙ্গী চরে আছাড় খেয়ে চুরমার হয়। সত্যেন ও কয়েক জন জেলে জলে ঝাঁপ দিয়ে নৌকা বাঁচাতে চেষ্টা করল, ডিঙ্গীটিকে টেনে তুলল ডাঙ্গার উপর। এদিকে মুষল ধারে বৃষ্টি, প্রচণ্ড ঝড় আর অবিরাম বজ্রপাত।

সকলেই ভাবছে. কি করবে এবং কোথায় যাবে। চিত্তরঞ্জন নির্বিকার। তাঁর চিন্তা কি?

নৌকটি যখন ডুবতে উদ্যত তখন তাকে চরের দিকে ঘুরাল কে? যিনি নৌকা রক্ষা করেছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। কজন মানুষ বিপদের সময় এমন ভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে?

এমন সময় দূরে একটি আলো দেখা যায়; সকলেই সে দিকে ছুটতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে সকলে উপস্থিত। বাইরে মানুষের কথা শুনে এক বৃদ্ধ বের হয়ে এল; সকলের কাছে নিবেদন জানায় যে দুর্যোগের রাত্রিটা সকলে যেন তার কুটীরেই কাটায়। কী আন্তরিকতা!

তাঁরা ত আশ্রয়ের জন্যই এসেছেন। সুতরাং কি আপত্তি হতে পারে? সকলের ভিজা কাপড়ের জলে কুটীরের মেঝেটি কাঁদায় ভরে গেল। গা মুছে কাপড় ছেড়ে সকলে সেই কাঁদার মধ্যেই স্থান করে নিলেন। ওদিকে ঝড় কুটীরের ছাউনিটাকে নিয়ে টানাটানি করছে! এই বুঝি উড়ে যায়। সত্যেন ও কয়েকজন মিলে ছাউনিটি টেনে রাখার চেষ্টা করছে। এদিকে খুটি ঠেস দিয়ে চিত্তরঞ্জন ঘুমে বিভোর।

কুটীরের এদিক সেদিক ছড়ান আছে সাপুড়ের ঝাঁপির মত অনেক ঝাঁপি। লোকটা কি তবে সাপুড়ে?

নদীর মুখ থেকে বেঁচে কি সাপের মুখে প্রাণ দিতে হবে ?

লোকটা সত্যই সাপুড়ে। সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "ভয় কি মা-ঠারান ? ওরা কিছু বলবে না। দেখবেন ?

লোকটা ঝাঁপির মুখ খুলে দিতেই প্রকাণ্ড একটি বিষধর সাপ দুলতে থাকে। মেয়েরা ভয়ে অস্থির।

তাদের অনুরোধে সাপুড়ে সাপটাকে ঝাঁপির মধ্যে রেখে দেয়। ওরা যেন বৃদ্ধের পরমাত্মীয়।

ঝড় থামলে আবার যাত্রা সুরু হয়। বৃদ্ধ সাপুড়ে সকলের সঙ্গে নদীর তীর পর্য্যন্ত আসে।

সকলকে বিদায় দিয়ে বলে, "আজ আমার জন্ম সার্থক।"

বাসন্তী দেবীর দিকে চেয়ে বলে, "মা-ঠারান, আবার আইস।"

সজল চোখে দেশবন্ধু বলেন, "এই আমার দেশের লোক; আমারা এদের চিনিনা। আমরা এমন প্রাণ দিয়ে অতিথিকে সেবা করতে পারি ? আমাদের দেশের আদর্শ ওরাই বাঁচিয়ে রেখেছে।"

দুলতে দুলতে, নাচতে নাচতে নৌকা অগ্রসর হয়। পরদিনও সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড়। নৌকা ছেড়ে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে হল। আশ্রয় দিলেন এক

তরুণী, তার স্বামী অনুপস্থিত। শিশু পুত্রের হাতধরে এসে সেই তরুণী সকলকে ভিতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে তাদের যা কিছু শুকনো কাপড় ছিল, তাই এগিয়ে দিল। তারপর সেই অসময়ে রাঁধতে বসে গেল। মোটা চালের ভাত, মুগের ডাল, পটল ভাজা আর ঘি। কত আদর করে খাওয়ালো! অতিথির নাম ধাম সে জানত না; দেশবরেন্য নেতা জ্ঞানে তাঁদের সেবা করে নাই; করেছে অতিথি জেনে।

চিত্তরঞ্জন বহুবার গর্ব করে বলতেন, "এমন তৃপ্তি করে কখনও খাইনি। এমন ভাবে অতিথি সেবা আমাদের দেশেই সম্ভব।"

নিরক্ষর পল্লী বধু গৃহস্বামী অনুপস্থিতির অজুহাতে অতিথিকে বিমুখ করে নাই।

৫

চারদিন দুর্য্যোগের মধ্যে কাটিয়ে এই মহামানব চাঁদপুর পৌছালেন। সহস্র সহস্র জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে—বন্দেমাতরম।

ধর্মঘটিদের দুর্দশা দেখে তিনি তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার থেকে তাদের সাহায্যের জন্য দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। ওদের সাহস দিয়ে বলেন, "যতদিন না সম্মানজনক

শর্ত্ত পাবে ততদিন কেউ কাজে যোগ দিওনা ; মাথায় মোট বয়েও যদি তোমাদের খরচ চালাতে হয় আমরা সে চেষ্টা করব।”

কয়েকদিন সেখানে থেকে তিনি ফিরে আসেন।

মাহাত্মাজী ঘোষণা করেছেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। সেই ফতোয়া শুনে বণিক বৃটিশ জাতি বেসামাল হয়ে পীড়ন সুরু করল। চট্টগ্রামে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এবং গোয়ালন্দে বসন্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধুর কাছে সংবাদ পৌছায় যে সেখানে জনতা এত উত্তেজিত হয়েছে যে একটা অঘটন ঘটতে পারে। পাছে জনসাধারণ কোন হিংসাত্মক কাজ করে এই ভয়ে তিনি তাঁদের জামিনে মুক্তি নিতে বলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে সকলেরই বিরুদ্ধবাদী থাকে। জামীনে মুক্ত হওয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থন করা অসহযোগ আন্দোলনের নীতি বিরুদ্ধ। এতে গোঁড়াপন্থীরা খুব সমালোচনা করতে থাকেন। দেশবন্ধু অন্যের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার থেকে অতগুলি টাকা দিয়ে দিলেন এতেও তাদের আপত্তি ছিল।

দেশবন্ধু তাঁদের বুঝিয়ে বললেন যে আন্দোলন যাতে অহিংস থাকে সেজন্যই তিনি জামীনের ব্যবস্থা করেছেন। আর তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের টাকার কথা বললেন

যে অতগুলি লোককে বাঁচাতে তাঁকে এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। নইলে তিনি কলিকাতা ফিরে যেয়ে সভা ডেকে যদি টাকা মঞ্জুর করতেন তবে ওদের দুঃখের মাত্রা আরও বেড়ে যেত। এমন কি অনাহারে অনেকের মৃত্যুর সম্ভবনা ছিল। সমালোচকগণ নিরস্ত হলেন।

দেশে অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে সরকার খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ করল যে যুবরাজকে ভারতে পাঠালে তাদের মনের পরিবর্তন হবে এবং তাদের মধ্যে রাজভক্তি নিশ্চয় বাড়বে। কিন্তু ফল হল উল্টা। কংগ্রেস দেশবাসীকে অনুরোধ জানাল যে যুবরাজ যেদিন ভারতে পৌছাবেন সেদিন সারা ভারতে হরতাল পালন করতে হবে। সারাভারতেই হরতাল হল। কিন্তু কলিকাতার মত এত সুন্দর হরতাল আর কোথায়ও হয় নাই। পথঘাট নির্জন এবং যানবাহন শূন্য, সর্বত্র দোকানপাট বন্ধ। দেশবন্ধুর সুপরিচালনা এবং সুভাষ ও তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই ইহা সম্ভব হয়েছিল।

কলিকাতার হরতাল দেখে স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজ ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার সুরু করল যে কলিকাতায় কংগ্রেসরাজ চলছে। সত্বর এর প্রতিকার না করলে ইংরেজ রাজত্ব আর টিকে না। তারা পরামর্শ

দিল যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। তার পরদিন থেকে তাই করা হল।

এবার সঙ্ঘর্ষ আসন্ন দেখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি স্থির করে যে দেশবন্ধু হবেন বাংলা দেশের নিয়ামক। তিনিই ঠিক করবেন তারপর কে নিয়ামক হবেন। আনন্দের কথা এই যে নিখিল ভারত কংগ্রেস ও বাংলার এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতে থাকে।

চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের ত্যাগ, কর্মকুশলতা ও সাহসকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি সব সময় তাঁদের প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দিতে অহ্বান করতেন। তাঁর চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়। অনেক বিপ্লবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এর শক্তি বৃদ্ধি করে।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিদেশী বস্ত্র ভস্মীভূত করা আরম্ভ হল। চিত্তরঞ্জন তাঁর নিজ বাড়ীর বিদেশী কাপড় জড় করে পোড়াবার ব্যবস্থা করলেন। আগুন ধরালেন সুভাষচন্দ্র। বিদেশী সরকার উগ্রমূর্তি ধারণ করে। নানা স্থান থেকে নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের খবর আসতে থাকে।

কংগ্রেস থেকে ব্যবস্থা করা হল যে এক দলে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক খদ্দর নিয়ে বের হবে। তারা খদ্দর ফেরী করবে আর দেশবাসীকে কংগ্রেসের কথা বুঝিয়ে বলবে।

৩রা ডিসেম্বর থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল আইন অমান্য আরম্ভ করে।

৬ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জনের একমাত্র ছেলে ভোম্বল স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীতে যোগ দেন। এতে দেশবন্ধু কত আনন্দিত ও গর্বিত! বলেন, "তাইতো! পরের ছেলেকে ডাকার আগে আমার নিজের ছেলেকে পাঠানই কর্তব্য।"

সহকর্মী, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ আপত্তি করে— ভোম্বলের শরীরটাত তেমন ভাল নয়।

একি চিত্তরঞ্জনের পক্ষে সম্ভব! তিনি তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন!

বিকেল বেলা খবর এল ভোম্বলকে গ্রেপ্তার করে লালবাজার নেওয়া হয়েছে। সে রাত্রেই সর্বত্র খবর রটে গেল যে সার্জেণ্টের নিষ্ঠুর প্রহারে ভোম্বল মারা গেছে। চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। ভগবান জানেন তাঁদের মনে কত উৎকণ্ঠা!

লোক ছুটে গেল লালবাজার থানায়। সেখানে সে নাই; তাঁকে আলীপুর জেলে নেওয়া হয়েছে।

হেমপ্রভা মজুমদার আলীপুর ছুটে গেলেন। গেলে কি হবে? কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমলই দেয় না। তিনি ও ত সহজ পাত্রী নন। হুঙ্কার দিয়ে বলেন যে জেলের বাইরে হাজার হাজার লোক উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। তাঁকে ভোম্বলের সাথে দেখা করতে না দিলে তারা জানবে

যে তাঁর মৃত্যু সংবাদ সত্য। তখন কলিকাতায় যদি আগুণ জ্বলে উঠে তার জন্য দায়ী হবে আলীপুর জেলের কর্তৃপক্ষ।

এবার জেলকর্তৃপক্ষ নরম হল। হেমপ্রভা দেবী দেখেন যে ভোম্বল বেঁচেই আছেন কিন্তু অর্দ্ধমৃত। তার সর্বাঙ্গে আঘাতের দাগ।

পরদিন বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হল। তিনি স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে বের হয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন আন্দোলন পরিচালনা নিয়েই ব্যস্ত।

ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জি বাসন্তী দেবীর ভাই হন। কাউকে কিছু না বলে তিনি বাসন্তী দেবীকে জামীনে মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বাসন্তী দেবী কিন্তু জামিনে মুক্ত হতে রাজী নন। চাটার্জি নিরস্ত হলেন না; গেলেন গর্ভনর লর্ড রোনাল্ডসের কাছে। বোনের মুক্তির ব্যবস্থা করে চাটার্জি মশায় চিত্তরঞ্জনকে সুসংবাদটি দিতে ছুটে এলেন।

রোষে ক্ষোভে চিত্তরঞ্জন গর্জে উঠলেন, "তুমি কার অনুমতি নিয়ে একাজ করেছ? আমাদের সমস্ত শ্রম তুমি পণ্ড করে দিলে। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে একথা ভাবতেও আমি লজ্জা বোধ করি।"

চাটার্জি মশায় বলেন, "বাসন্তী আমার বোন; তার এ অপমান আমি সইতে পারিনা"

চিত্তরঞ্জন হেসে বললেন, "ও, বাসন্তী তোমার বোন

তাই একাজ করেছ, সে অন্য কারও বোন হলে বোধকরি অপমান বোধ করতে না।”

বাসন্তীদেবী জেল থেকে বের হতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জেলার জানালেন মুক্তির আদেশ হলে কোন বন্দীকে আর তারা জেলে রাখতে পারেন না। কাজেই জেল ছেড়ে আসতে হল।

পরদিন তিনি আবার স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে বের হন, কিন্তু আর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল না। বরং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে লর্ড রোনাল্ডসে ব্যক্তিগত ভাবে দেশবন্ধুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন।

একদিন মহারাজা প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে লর্ড রোনাল্ডসে তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি লাট-প্রসাদে যেতে প্রস্তুত কিনা। দেশবন্ধু জানান ভদ্রতার খাতিরে তাঁর আপত্তি নাই।

লাটসাহেব ডেকে পাঠালেন ; দেখাও হল। কিন্তু কোন ফল হলনা। আপোষের কথাই হয়েছিল। লাট-সাহেব জানালেন যে মীমাংসা বৈঠক বসার আগে হরতাল, পিকেটিং প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে। দেশবন্ধু বলেন যে আগে সরকারকে দমন নীতি মূলক আদেশ গুলি প্রত্যাহার করতে হবে এবং কতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর হবে সে সম্বন্ধে ও একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

লাট-সাহেবের কথা হল যে কংগ্রেসকেই আগে

আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু দেশবন্ধু তাতে রাজীনন। সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যতীত কংগ্রেসের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আলোচনা ভেঙ্গে গেল।

লাট-সাহেব ভদ্রভাবে জানালেন যে তাঁদের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে।

দেশবন্ধু হাসলেন। লর্ড রোনাল্ডসে ব্যক্তিগত ভাবে দেশবন্ধুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

এর দুইদিন পরেই দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়; বিচারে তাঁর ছয়মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হল। তাঁকে সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। সেখানে একই ঘরে থাকতেন সুভাষচন্দ্র, ভোম্বল এবং আরও অনেকে।

জেলে তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে। বাড়ী থেকে কেউ দেখা করতে এলে অফিস ঘরে দেখা করতে হয়, আর সেখানে চিত্তরঞ্জনকে হেটে যেতে হয়। এতে তাঁর খুব কষ্ট হয়। সুতরাং বাসন্তী দেবী স্থির করেন যে তিনি আর দেখা করতে যাবেন না।

কথাটা কিভাবে লাট-সাহেবের কানে গেল। গভর্ণর হাউস থেকে ফোন এল যে বাসন্তী দেবী বা তাঁদের লোকজন ইচ্ছে করলে সেলে যেয়েই দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, প্রয়োজন বোধকরলে সারাদিন সেখানে থাকতে ও পারেন। আরও বলা হল যে দেশবন্ধুর খাবার বাড়ী থেকে আনতে দিতেও তাদের আপত্তি নেই।

কিন্তু দেশবন্ধু তাতে রাজীনন। তাঁর ঘরে যত জন আছে সকলের খাবার যদি বাড়ী থেকে আনতে দেয় তবেই তিনি বাড়ীর খাবার খাবেন।

শরীর আরও খারাপ হতে থাকে। অবস্থা গুরুতর দেখে কর্ত্তৃপক্ষ সকলের খাবার বাড়ী থেকে আনতে দিতে রাজী হল।

শরীর অত খারাপ, কিন্তু মনের স্ফূর্তির কমতি নেই। সকলকে নিয়ে হাস্য পরিহাসে আনন্দেই দিন কাটান।

একদিন সুভাষকে বলেন, "সুভাষ, জেল থেকে বের হয়েই এবার তোমার একটা বিয়ে দিতে হবে।"

সুভাষ সলজ্জভাবে বলেন, "আমার অপরাধ" ?

"আমার অর্থের প্রয়োজন—তা তোমার জন্য নিশ্চয়ই লাখ খানেক টাকা পাওয়া যাবে, কি বল ?"

কিরণশঙ্কর রায় রসিক লোক। তিনি বলেন, "সুভাষ তোমার তবু বাজারে দাম আছে—আমরা ত একেবারেই অচল পয়সা।"

এরকম হাসি তামাসা প্রায়ই হয়।

এদিকে চৌরি চৌরাতে বেশ গোলমাল হল। সেখানে পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনসাধারণ থানাটি পুড়ে দেয় এবং কিছু পুলিশকেও মেরে ফেলে।

মহাত্মাজী ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে আন্দোলন বন্ধ

করে দেন। দেশের লোকের সামনে রইল শুধু সূতাকাটা ও অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি কাজ।

এতে অনেক কংগ্রেস কর্মী মহলে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাদের অভিমত যে অন্ততঃ দেশবন্ধু, মতিলাল ও লাজপত রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে মহাত্মার একটা সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল।

দেশবন্ধু ও খুব আপশোষ করতে থাকেন—কি করলেন মহাত্মাজী! ভারতের মত বড় একটা দেশে চৌরি চৌরা ঘটবেই। তার জন্য সমস্ত প্রদেশে আন্দোলন বন্ধ হবে কেন? বাংলায় ত কিছু ঘটে নাই। বাংলার দোষ কি?" সরকার পক্ষ থেকে গোপনে গোপনে আপোষের চেস্টা চলতেই থাকে। এবার চেস্টা চলে মদন মোহন মালব্যের মারফৎ। প্রাথমিক প্রস্তাব এই যে যুবরাজ যেখানে যায় সেখানে হরতাল যেন না হয়। তাহলে সরকার দমননীতি বন্ধ করবেন এবং অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর শান্ত পরিবেশে রাজনৈতিক আলোচনা চলবে।

এই আপোষ রফার প্রস্তাবে মহাত্মার খুব আগ্রহ ছিলনা। সরকার আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি দিতে অনিচ্ছুক মহাত্মাজী তাঁদের মুক্তি চান।

জেলের মধ্যে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ,

মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রভৃতির সঙ্গে এসম্বন্ধে পরামর্শ করেন। তারা এই আপোষ প্রস্তাবে সম্মত।

জেল থেকে দেশবন্ধু মহাত্মার নিকট তার করেন :— নিম্নলিখিত সর্তে হরতাল বন্ধ করা যেতে পারে—

১। কংগ্রেসের দাবী সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকা হবে

২। দমন নীতি বন্ধ করতে হবে এবং এসম্পর্কে সকল ইস্তাহার প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। কারারুদ্ধ কংগ্রেসী ও খিলাফৎকর্মীগণকে মুক্তি দিতে হবে।

মহাত্মার উত্তর আসতে বিলম্ব হল। তিনি বললেন, আলোচনা সভায় কাহাদিগকে ডাকা হবে আগে তাহা জানাতে হবে।

সরকার পক্ষের উৎসাহ তখন নিভে গেছে।

দেশবন্ধু আপশোস করতে থাকেন, "আমরা একটা সুবর্ণ-সুযোগ হারালাম।"

অনেক নেতাই দেশবাসীকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়েছেন যে কংগ্রেসের নির্দেশ মত কাজ করলে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস মধ্যে স্বরাজ করতলগত হবে। এ অবস্থায় কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্ত করে গোলটেবিল বৈঠকে বসতে পারলে দেশবাসীর মনোবল বেড়ে যেত ; তার ফলে ভবিষ্যৎ আন্দোলন আরও জোরালো হত।

দেশবন্ধুর ইচ্ছা ছিল যে সংগ্রামের মনোভাব ষোল আনা বজায় রেখে যখন যেটুকু সুবিধা আদায় করা যায় তা দখল করা ভাল। তারপর আবার লড়াই সুরু হবে।

অনেকে মনে করেন যে সে সময় দেশবন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত হলে আজ ভারত খণ্ডিত হত না।

দেশবন্ধু জেলে থাকতেই আমেদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; তার সভাপতি দেশবন্ধু। তাঁর অনুপস্থিতিতে সরোজিনী নাইডু সেই ভাষণ পাঠ করেন। সেখানে দেশবন্ধু দেশে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করতে বলেন।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়, বাসন্তী দেবী তার সভানেত্রী। দেশবাসীকে তিনি এক নূতন কথা শুনালেন; বললেন যে কংগ্রেসের উচিত কাউন্সিলে ঢুকে অত্যাচারী সরকারের সকল কাজে বাধা দেওয়া। এই কথা নিয়ে চারিদিকে খুব আলোড়ন হতে থাকে।

এদিকে জেলের ভিতর চিত্তরঞ্জনের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। সেখানে সুভাষ তাঁকে দিনরাত সেবা করতেন। আরেকটি লোকও তাঁর খুব সেবা শুশ্রূষা করত। সে এক খুনে ডাকাত; নাম মধুর। দেশবন্ধুর স্নেহে সে তার বশ হয়ে পড়ে।

মুক্তিলাভের সময় দেশবন্ধু তাঁকে বলেন, "মধুর, তুইত

কিছু দিন পর মুক্তি পাবি। খালাস হয়ে তুই আমার বাড়ী যাস, সেখানেই বাকী জীবন থাকবি—বুঝলি ?”

মথুর সম্মতি জানায় এবং মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধুর বাড়ীতেই থাকে। তাঁর উপর তার কত আব্দার আর শাসন ! স্নানের বেলা হয়েছে, খাবারও তৈরী। দেশবন্ধু আলোচনায় ব্যস্ত; সময় বয়ে যায়।

মথুর এসে তাঁকে ধমক দেয়, “বাবা, আর গল্প করতে হবেনা। অনেক বেলা হয়েছে, স্নানের জল তৈয়ার এবার উঠুন।”

উপস্থিত লোকগণও তার শাসন থেকে রেহাই পায় নাই। তাদের বলত, “আপনারা কি বাবাকে নাওয়া খাওয়া করতে দিবেন না ? এবার উঠুন।”

বাড়ীর মেয়েরা কিন্তু ওকে খুব ভয় করত। স্বভাব যায়না মৈলে।

মানুষের উপর দেশবন্ধুর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর ধারণা নিছক পেটের জ্বালাতেই মানুষ ও সব পথে নামে। সুযোগ পেলেই তারা শুধরে যায়।

কিন্তু মথুর প্রমাণ করে গেল মানুষের স্বভাব সহজে বদলায় না। একদিন মথুর উধাও; এদিকে দেশবন্ধুর বাড়ীর একটি গহনার বাক্স ও পাওয়া যায়না।

দেশবন্ধুর মনের সন্দেহ কিন্তু তবুও ঘুচেনা। লোকটা মোটর চাপা পড়েও ত মারা যেতে পারে। হয়ত কিছু বলে

যেতে পারে নাই। গহনার বাক্সের কথা? তাঁর বাড়ী কত লোক আসে যায়। সকলেই যে ভাল তা ত নয়।

দেশবন্ধুর মুক্তির তারিখটি সরকার কিন্তু গোপন রেখেছিল, পাছে জেল গেটে অস্বাভাবিক ভিড় হয়ে কোন গোলমাল হয়।

জেলে স্বাস্থ্য একদম ভেঙ্গে গেছে; ঘুসঘুসে জ্বর আর রক্ত শূন্যতা। স্থির হল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কাশ্মীর যাবেন। এসংবাদ কাগজে বের হওয়াতে প্রতি-ষ্টেশনে ষ্টেশনে অস্বাভাবিক ভিড়। সকলে তাদের প্রিয় দেশবন্ধুকে দেখতে চায়। নিয়ে আসে ফুল, ফল, দুধ ও মিষ্টি; যে যা পারে। গভীর রাত্রিতেও রেহাই পান না; ঘুম থেকে উঠে জনতার সামনে দাঁড়াতে হয়।

কাশ্মীরের পথে শরীরের একটু উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু কোহালায় যেয়ে ভীষণ জ্বর হয়; সে জ্বর দিন দিন বাড়তে থাকে। সে অবস্থায় বারমূলা এসে পৌছেচেন; সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে শ্রীনগর যাবেন। এখানে কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেট ও কয়েক জন পদস্থ কর্মচারী উপস্থিত। তারা জানালেন যে দেশবন্ধুকে লিখে দিতে হবে যে তিনি সে রাজ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন করবেন না। লিখে দিলে তিনি সেখানে রাজার অতিথি হিসাবে থাকবেন, নইলে তাঁকে সে রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হবেনা।

এমন অপমান জনক প্রস্তাবে তিনি কি সম্মত হতে পারেন ? মারীতে ফিরে এলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসী তাঁকে একটি মাদুলী দিয়ে বলেন, "বেটা, এটা তুমি সর্বদা পর, তোমার শরীর ভাল হয়ে যাবে। সাবধান, হারিয়ে যেন না যায়।"

সাধু সন্ন্যাসীদের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।• বিশ্বাসের জন্যই হউক কিম্বা অন্য যে কোন কারণে হউক মাদুলি ধারণ করার পর থেকেই তাঁর জ্বর কমতে থাকে।

ফিরবার পথে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তিনি কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন। কাউন্সিলে ঢুকে বুরোক্রেসীর মুখোসটা ছিড়ে ওর প্রকৃত রূপটা দেশবাসীকে দেখাতে হবে। ভালমন্দ সব কাজেই বাধা দেওয়া চাই।

তাঁর ধারণা যে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা শীঘ্রই নিস্তেজ হয়ে আসবে। তখন দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বজায় রাখতে নূতন আন্দোলন চাই। কাউন্সিলে বাধাদান নীতি অনুসরণ করলে সেখানে নিত্য নূতন সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হবে।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে তিনিই সভাপতি। সেখানে কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব উঠল, কিন্তু দেশবন্ধু পরাজিত হলেন।

চারিদিকে ছিঃ ছিঃ রব পড়ে গেল। দেশবন্ধু

একি করছেন ! মহাত্মাজী কারাগারে ; তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি মাহাত্মার বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন !

দেশবন্ধু অবিচলিত। সভাপতির পদ ছেড়েদিলেন, কিন্তু কংগ্রেস ছাড়লেন না। সেই সভাতেই বললেন— আজ তিনি পরাজিত হয়েছেন সত্য ; কিন্তু একদিন— এক বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেস তাঁর মতে আসবে। সেখানেই তিনি মতিলাল নেহেরু, জয়াকার প্রভৃতির সঙ্গে স্বরাজ্য দল গঠন করেন।

স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য প্রচার করতে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কাউন্সিল প্রবেশ সমর্থনকারীর সংখ্যা সর্বত্র বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী কংগ্রেস দিল্লীতে ; মৌলানা আজাদ সেখানে সভাপতি। এদিকে মহাত্মা জেল থেকে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ যেন সৃষ্টি না হয়।

দিল্লী কংগ্রেসে কাউন্সিলপ্রবেশনীতি সমর্থিত হল। যেমন কথা তেমন কাজ।

নির্বাচন এসে গেল। এবার কাজের পালা। এক একটি প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন রাজনীতিতে নবাগত কর্মীকে ; যেমন অ্যাড-

ভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন দাশের বিরুদ্ধে সাতকড়ি পতিরায়, স্যর সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডা: বিধান রায়। তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বিধান রায় অপরিচিত। দেশবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মকুশলতার ফলে প্রায় সর্বত্র কংগ্রেস জয়ী হল।

নির্বাচনে হেরে সতীশরঞ্জন দাশ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমাকে হারায়েছ তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু খালি-পা-ওয়ালা লোক দিয়ে আমাকে হারালে।"

"এখন বুঝে দেখ দেশের লোক খালি-পা-ওয়ালা লোকদের কেমন ভালবাসে।"

স্বরাজ্য দলই সংখ্যা গরিষ্ঠ দল; সুতরাং লর্ড লিটন মন্ত্রীসভা গঠন করতে তাঁকে ডাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের আপত্তি থাকায় তা সম্ভব হল না। কিছু দিন কাজ চলার পর সকলে বুঝতে পারে দেশবন্ধুর কথা কেমন সত্য! স্বরাজ্য দলের এক একটি কাজে দেশবাসীর উৎসাহ ও উত্তেজনা কত! যেদিন কাউন্সিলে ভোটে মন্ত্রীদের বেতন অগ্রাহ্য করা হয় সেদিন দেশব্যাপী তুমুল হর্ষধ্বনি।

এরপর কর্পরেশন নির্বাচন আরম্ভ হল। সেখানেও স্বরাজ্য দলের বিরাট সাফল্য। দেশবন্ধু হলেন কর্পরেশনের প্রথম মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র তার প্রধান কর্মকর্তা। তাঁরা প্রকৃত জনসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ

করেন। দরিদ্রের উপকারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, বিনা মূল্যে চিকিৎসা, স্বল্প মূল্যে দুধ সরবরাহ প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ দেখে দেশবাসী বিস্মিত হয়। তখন প্রত্যেকটি কর্মীর মনোভাব ছিল—দেশের জন্য আমি। আজ অনেকের কার্য্যকলাপে মনে হয় যে তারা ভাবেন—তাদের জন্য দেশ।

তাঁর দুর্বল শরীরের উপর এত কাজের চাপ! শরীর একদম ভেঙ্গে গেল!

কিন্তু বিশ্রামের উপায় নাই। সমস্যার পর সমস্যা, কাজের উপর কাজ। তারকেশ্বর মন্দির পরিচালনা নিয়ে তখন খুব গণ্ডগোল চলছে। মোহন্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে রাশি রাশি অনাচারের অভিযোগ; এই তীর্থক্ষেত্রটি হয়েছে পাপক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল। কংগ্রেস থেকে এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হল। মোহন্ত সতীশ গিরি তখন রক্ষা করে ব্যাপারটি চাপা দিতে ব্যস্ত। কিন্তু প্রতিকূল হল ব্রাহ্মণ—সভা। এসব ব্যাপারে অব্রাহ্মণরা নাক ঢুকাবে কেন? আরম্ভ হল সত্যাগ্রহ। তাঁর ডাকে যুবকগণ দলে দলে জেলে যায়। এখানেও তিনি নিজের ছেলেকে জেলে পাঠায়ে অন্যের ছেলেকে ডাক দিলেন। শেষে নিজেই সত্যাগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ভয় পেয়ে সতীশ গিরি আপোষ করে ফেললেন। স্থির হল যে তিনি তাঁর শিষ্য প্রভাত গিরিকে গদী ছেড়ে দিবেন, দেব সম্পত্তির

আয়ের একটা অংশ যাত্রী ও জন সাধারণের কল্যাণে ব্যয় হবে।

দেশবন্ধু বলতেন স্থানীয় সমস্যা উপলক্ষে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশ বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবে।

মহাত্মা মুক্তিলাভ করার পর স্বরাজ্যদলের কাজকর্ম নিয়ে দেশবন্ধু ও মতিলালের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একটা চুক্তি ও হয়। স্থির হল মহাত্মা থাকবেন সুতাকাটা ও অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ নিয়ে আর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার থাকবে স্বরাজ্য দলের উপর। এই চুক্তির নাম হল গান্ধী-দাশ প্যাক্ট।

এসময় বিপ্লবী দলের কার্য্য কলাপ খুব বৃদ্ধি পায়। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারতে যেয়ে গোপীনাথ সাহা অন্য একটি ইংরেজকে হত্যা করে। বিচারে গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হাসতে হাসতে ফাঁসীকাষ্ঠে দাঁড়ায়ে গোপীনাথ গাইল—বন্দেমাতরম।

দেশবন্ধুর চেষ্টায় সিরাজগঞ্জ প্রদেশিক সম্মেলনে গোপীনাথের স্বদেশ প্রীতির প্রশংসা করে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এতে ভীষণ চটে গেল, আর অসন্তুষ্ট হলেন মহাত্মাজী।

তারপর ডাক্তারদের পরামর্শে চিত্তরঞ্জনকে সিমলা পাঠান হল; কিছুদিন সেখানে থাকবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বেঙ্গল আডিভ্যান্স বলে বাংলা দেশে

সর্বত্র ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেছে। বিপ্লবীগণকে ত ধরা হচ্ছেই ; সুভাষচন্দ্র, অনিল বরণ রায়, সত্যেন্দ্র মিত্র—এরাও রেহাই পেলেন না! সরকার চিৎকার সুরু করেছেন যে দেশের তখন নাকি এক ভীষণ অবস্থা।

বাংলার এই দুর্দিনে দেশবন্ধুকে আর সিমলায় রাখা গেল না। তিনি সকলের বাধা উপেক্ষা করে কলিকাতা ছুটে এলেন। শরীর খুবই খারাপ। ফিরিবার পথে সেই মাদুলীটি হারিয়ে গেল।

আবার লর্ড-লিটন মারফৎ আপোশের ইঙ্গিত এল, কিন্তু ফল হলনা।

বাংলার অবস্থাতে মহাত্মাজীও বিচলিত হলেন। তিনিও মতিলাল নেহেরু বাংলায় ছুটে এলেন। মহাত্মা ঘোষণা করেন যে তিনি বিপ্লবীদের সমর্থক নন, কিন্তু সরকারের কাজ বিপ্লবীদের কাজের চেয়েও হীনতর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে স্বরাজ্যদলের সাফল্যে সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

অসুস্থ শরীর নিয়েই চিত্তরঞ্জন কাজে ডুবে গেলেন। তিনি একাই একশ। ১৯২৫ সনের ৭ই জানুয়ারী কাউন্সিলে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বিল পাশ হবে। কয়েকদিন আগে হতেই দেশবন্ধু ভীষণ কলিক ব্যথায় কাতর। অসহ্য যন্ত্রণা, একেবারে শয্যাগত, কথা বলতেও কষ্ট হয়। তবু ও সকলকে বলছেন, "ডাক্তারকে বল আমাকে ভাল করে দিতে; আমাকে সেদিন কাউন্সিলে যেতেই হবে।"

সেদিন তাঁকে ধরে রাখা গেলনা।

শুধু বলছেন—আজ আমাকে যেতেই হবে, এতে যদি মরে যাই তাও ভাল। আগে আমার কর্ত্তব্য, তারপর আমার শরীর। আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিনা বিচারে নির্বাসিত, আর আমি শারীরিক কষ্টের জন্য আমলাতন্ত্রকে দেশের প্রতিনিধি দ্বারা সে প্রস্তাব পাশ করার সুযোগ দেব? প্রাণ থাকতেও তা হবেনা।

দেশবন্ধুকে ধরাধরি করে কাউন্সিল গৃহে নেওয়া হল। সেই অবস্থাতে তাঁকে আসতে দেখে সরকার পক্ষের কয়েক-জনের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে; তারা সরকারের বিপক্ষে ভোট দেয়। ভোটে দেশবন্ধুর জয় হল।

গভর্ণর কিন্তু তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলটি পাশ করে দেন। শাসন সংস্কার যে কত ভূয়া তা দেশবাসী ভালভাবেই বুঝতে থাকে।

এরপর শরীরের কারণে পাটনা ভাইয়ের বাড়ী যেয়ে কিছুদিন থাকেন। এখানেও লোক মারফৎ আপোষের প্রস্তাব আসে।

পাটনা যাবার পূর্বেই তিনি তাঁর রসা রোডের বাড়ী ট্রাস্ট ডিড' করে স্ত্রী জাতির কল্যাণের জন্য দিয়ে যান। আর একদিনের জন্যও সে বাড়ীতে রইলেন না।

মেয়েকে বললেন, "তোর বাড়ীতে থাকতে দিবি? যে বাড়ী দিয়ে দিয়েছি সেখানে আর একদিনও থাকব না।"

পনর দিন মেয়ের বাড়ীতে থাকেন। তাঁকে বাড়ীতে রাখাও বিপদের কথা। আহারের ডাক পড়েছে, এদিকে ঘর লোকে পূর্ণ। এ বাড়ীতে সকলের রান্না হবার কথা নয়—সেকথা খেয়াল নাই।

সকলকে ডেকে বলেন, "চলুন, খাবার তৈরী, এ সময় খেয়ে নেওয়া যাক।"

বাড়ীতে প্রতিদিন বিশ পঁচিশজনের পরিমান অতিরিক্ত রান্না করতে হত। যে আসত তাকেই খেতে বলতেন।

মে মাসে ফরিদপুর প্রদেশিক সম্মেলনের পূর্বেই ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেডের কাছ থেকে আপোষের ইঙ্গিত আসে। সেখানে সভাপতির ভাষণে তিনি কোন পথে আপোষ রফা হতে পারে সে সম্বন্ধে আভাস দেন। আইন অমান্য আন্দোলন দেশের ব্রহ্মাস্ত্র; এটা প্রয়োগ করতে হবে শেষ সময়ে। অর্জুন তাঁর পাশুপত অস্ত্র আগে প্রয়োগ করেন নাই কর্ণ একাঘ্নী অস্ত্র রেখেছিলেন চরম সঙ্কট মুহূর্তের জন্য। কংগ্রেস ও তাই করবে।

এই স্পষ্ট কথায় অনেকে অসন্তুষ্ট হয়; প্রচুর বিরূপ সমালোচনা হয়। এনিয়ে এত তিক্ততার সৃষ্টি হয় যে তিনি ব্যথিত অন্তরে সেখান থেকে ফিরেন। স্থির করলেন শরীরটা সুস্থ করে ফিরে এসে বিরুদ্ধ বাদীদের তাঁর মতটা ভাল করে বুঝাবেন।

বায়ু পরিবর্তনের জন্য এবার তিনি দার্জিলিং গেলেন।

মার নিষেধ ছিল যে তাঁদের বংশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কেউ যেন দার্জিলিং না যায়। একথা সে সময় কারও মনে ছিলনা।

দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে শিশির ভাদুড়ী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেশবন্ধু তাঁকে কথা দেন যে ফিরে এসে তিনি জাতীয় নাট্যশালা গঠনের কাজে হাত দিবেন। দার্জিলিং এ মহাত্মাজী এবং অ্যানি বেশান্ট এসে দেখা করেন। আপোষের কথা এবং কমনওয়েলথে যোগদান সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলে।

কয়েকদিন স্বাস্থ্যের একটু উন্নতির পর আবার শরীর খারাপ হতে থাকে। প্রতি সোমবার জ্বর হয়।

১৬ই জুন বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন বাংলার হৃদয়ের ধন দেশবন্ধুর পবিত্র আত্মা শান্তিময়ের ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করে।

মৃত্যুহীণ প্রাণ- অমর হয়ে রইল দেশবাসীর মনে।

তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে ট্রেন যখন শিয়ালদহ পৌছাল তখন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—বন্দেমাতরম।

তারপর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়।